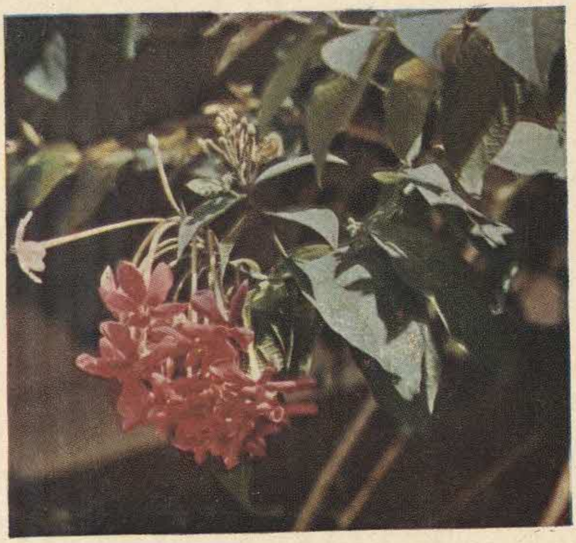
প্রকৃতি পাঠ

প্রকৃতি পাঠ

(পঠন-পাঠন সংহিতা)

(NATURE STUDY : TEACHERS' MANUAL)

অনিল কুমার দে

মুখ্য সম্পাদক

অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

প্রকল্প বিশ্বভারতী

(PROJECT VISVA-BHARATI)

প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯৪
এপ্রিল ১৯৮৭

সম্পাদকমণ্ডলী

অধ্যাপক অনিল কুমার দে (মুখ্য সম্পাদক)

অধ্যাপক অসিত বরণ দাস

ডঃ সুধেন্দু মণ্ডল

ডঃ ব্রতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস, বোলপুর
পরিশিষ্টের রঙীন চিত্রগুলির মুদ্রাকর—
রেডিয়েন্ট প্রসেস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা



* উৎসর্গ *

বিংশ শতাব্দীর পরিবেশ শিক্ষার পথিকৃৎ
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
১২৫ তম জন্মবর্ষে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
প্রকল্প বিশ্বভারতীর
শ্রদ্ধাঞ্জলি

* * * * * * *

VISVA-BHARATI

ACHARYA
RAJIV GANDHI

UPACHARYA
[N]IMAI SADHAN BOSE

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

SANTINIKETAN 731 235
WEST BENGAL, INDIA
Telephone: BOLPUR 451 (6 lines)

[Ref]. No.

বিশ্বভারতীর বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিষয়ক চর্চার
শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই, ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্য-
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই- প্রকৃতি পাঠ-
পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। কালক্রমে প্রকৃতি পাঠের
পঠন-পাঠনের হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।
কিন্তু মূল লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। রবীন্দ্র
শিক্ষাদর্শে প্রকৃতি পাঠ ও পরিচয়ের গুরুত্ব অসীম,
প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়,
প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল, পৃথিবীর
গতির ফলে দিন রাত্রি হচ্ছে, ঋতুর পরিবর্তন
ঘটছে। আকাশে কোন সময়ে ঘন মেঘের
সঞ্চার, কখনও বা আকাশ হচ্ছে নির্মল
মেঘমুক্ত, এই পরিবর্তনের লীলা চলেছে,
গাছপালায়, ফলে ফুলে, নদী অরণ্যে। এই
সবই ঘটে এক নিয়ম অনুসারে, প্রকৃতির
মধ্যে বিশৃঙ্খলা কম, যদিও প্রকৃতি কিছুটা
খেয়ালী কোন কোন সময়, প্রকৃতি পাঠের
মধ্য দিয়ে সেই নিয়ম ও চরিত্রের সঙ্গে
যেমন পরিচিত হবার সুযোগ রয়েছে—

তেমনি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও বৈচিত্র্যের সম্যক পরিচয় করারও অবকাশ রয়েছে। ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর তাৎপর্য গভীর,

এই বইটি সচিত্র ও সুলিখিত এবং তথ্যবহুল। প্রকৃতিপাঠের একটি সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরিশিষ্ট বইটির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখানে পৃথক পৃথক ভাবে আশ্রমের গাছপালা ও ফল ফুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাখীদের চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের। অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক নমুনা সারণীও দেওয়া হয়েছে। এক কথায় প্রকৃতি পাঠের ব্যবহারিক ও নান্দনিক উভয় দিকই আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শুধুমাত্র বিশ্বভারতীর শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নয়, সকলেই এই বইটি পড়ে লাভবান হবেন,

আনন্দ পাবেন।

যাঁদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় এই সুন্দর বইটি রচিত হয়েছে তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বইটির মুখ্য-সম্পাদক অধ্যাপক অনিল কুমার দে কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই তাঁর উদ্যমের জন্য। ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক এই বইটি প্রকাশের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আশা করি বইটি প্রাপ্য সমাদর পাবে।

নিমাইসাধন বসু

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

।। ভূমিকা ।।

এই শতাব্দীর ঊষালগ্নে শহরের কলকোলাহল থেকে দূরে এক দূষণমুক্ত শান্ত পরিবেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে যে মুক্তাঙ্গন পরিবেশে শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন তা এই শতাব্দীর পরিবেশ শিক্ষার দিশারী। উল্লেখ করা যায়, এর প্রায় ৬০ বছর পরে অনুরূপ শিক্ষাক্রম প্রচলিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির বিদ্যালয়ে।

গত পাঁচ বছর শান্তিনিকেতনে পরিবেশ শিক্ষা তথা প্রকৃতি পাঠের লুপ্তপ্রায় ধারাকে সঞ্জীবিত করার দুরূহ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে বিশ্বভারতী পরিবেশ চর্চা প্রকল্প। প্রাক্তন শিক্ষকদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যাদি থেকে যথাযথ অনুসন্ধান, সংযোজন, পরিমার্জনা ও পরিবর্তন করে এবং আকর্ষণীয় ছবি সন্নিবেশ করে এই পুস্তকটি রূপায়িত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষার মূল স্রোতের সঙ্গে প্রকৃতি পাঠের ধারা যাতে সহজে যুক্ত হতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এটি পাঠ্যপুস্তক নয়— পঠন-পাঠন নির্দেশক। এটি শিক্ষকদের সাহায্য করবে ছাত্রছাত্রীদের মনে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে পরিবেশ চেতনা উন্মেষ করার কাজে। আশা করা যায়, এই পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ে আদর্শ পুস্তক হিসাবে গৃহীত হবে এবং শিশুদের মনে প্রকৃতি পাঠের অনুপ্রেরণা দেবে।

শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ, ১৩৯৪

অনিল কুমার দে
মুখ্য সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকল্প বিশ্বভারতীর (Project Visva-Bharati) পরিবেশ চেতনা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে এই পুস্তক প্রকাশিত হল। কেন্দ্রীয় পরিবেশ সচিব টি. এন. শেষাণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বিশ্বভারতীর পরিবেশ চর্চা প্রকল্পের বার্ষিক অনুদান এই পুস্তক প্রকাশে আংশিক সহায়তা করেছে।

প্রকৃতি পাঠের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীবারীন্দ্রনাথ মৌলিকের সহযোগিতার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই। সম্পাদকমণ্ডলীর সহকর্মীগণ এই পুস্তক রচনায় ও সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন।

বইটির উৎসর্গ পৃষ্ঠার ছবির ব্লক দিয়েছেন রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষ। রঙীন ছবিগুলি তুলেছেন রবীন্দ্রভবনের আলোকচিত্রশিল্পী সমীরণ নন্দী। অন্যান্য ছবিগুলি এঁকেছেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের পারমিতা রায় এবং সহায়তা করেছেন ঐ বিভাগের চৌধুরী হাবিবুর রহমান ও আশীষ গুপ্ত।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক নিমাই সাধন বসু এবং পাঠভবনের অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুর-এর শুভেচ্ছা ও উৎসাহদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

মুখ্য সম্পাদক

সূচীপত্র

প্রকৃতি পাঠ : পাঠ্যক্রম

- বিভিন্ন ঋতুর ফুল
- পাখীর পরিচয়
- প্রাকৃতিক সম্পদ
- দেহ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য
- শারীরিক পরিশ্রম, শ্বাসকার্য ও হৃৎস্পন্দন
- জৈব ও অজৈব বস্তু পর্য্যবেক্ষণ
- বস্তু ও শক্তির উৎস
- দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা
- ভিটামিনজনিত রোগ
- সংক্রামক রোগের তালিকা
- বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টীকা
- নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু
- পেট্রোলিয়ামজাত বস্তু
- সূর্য্যের অবস্থান ও ছায়ার দৈর্ঘ্য
- বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যাভ্যাস

প্রকৃতি পাঠ : সূচনা

শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রকৃতি বিষয়ক চর্চার এক বিশেষ ধারা ছিল। সেই ধারা বর্তমান পাঠভবন বিদ্যালয়ে এখনও বহমান। বিদ্যারীতির যেমন পার্থক্য তৈরী হয়েছে, ঠিক তেমনই প্রাসঙ্গিকতাও বদলেছে। বর্তমান পৃথিবীতে প্রকৃতি সচেতনতা ক্রমশঃ জীবন-রক্ষার প্রশ্নের সংগে জড়িত হয়ে উঠেছে। ১৯০১ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে যে পাঠ্যক্রম সৃষ্টি হয়েছিলো তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে ষাট দশকে পশ্চাত্যের উন্নত দেশের বিদ্যালয়গুলি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি পাঠ শিক্ষাক্রমের পথিকৃৎ হচ্ছে বিশ্বভারতী।

অধুনা পরিচিত 'ইকোলোজী' নয় বরং সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধ-সম্ভব সচেতনতা আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রকৃতি পাঠের ভিত্তি। ১৯০৯ সালে ক্ষিতিমোহন সেনকে ছাত্র পরিচালনা সংক্রান্ত এক নির্দেশপত্রে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা লিখেছেন— "আশ্রমের পশুপক্ষী-তরুলতার সহিত ছাত্রদের চিত্তের যোগসাধনের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক! গ্রীষ্মে সহকার বনে উৎসব, বর্ষায় সপ্তপর্ণ-কুসুমোদ্গমের উৎসব, শরতে শেফালী উৎসব, বসন্তে শালমঞ্জুরীর উৎসব উপযুক্ত বেশ, সংগীত ও ভোজ্যের দ্বারা সমাধা করিতে হইবে।" বিশ্বপ্রকৃতির সংগে মানব-প্রকৃতির মিলনের উৎসবকে শিক্ষারীতির আধারে সন্নিবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে গুরুদেবের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। "শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি" শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে দিকনির্দেশ করেছেন, "আশ্রমে জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ও সম্পূর্ণতা সাধন করিয়া তাহাতেই ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্র করিয়া তুলিতে হইবে। তাহারা যাহা কিছু শিখিবে, এইখানে যথাসম্ভব তাহার প্রকাশ ও প্রয়োগের সুযোগ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্যক নৈপুণ্য-সাধন, দৃষ্টি ও মনন শক্তির সম্যক অনুশীলন, তরুলতা, পশুপক্ষী ও বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র ব্যাপার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও অনুরাগ চর্চা,... এইগুলি আমাদের আশ্রমে শিক্ষার অঙ্গ।... শিক্ষা-তালিকার মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ চর্চার বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করা চাই।... এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে গাছপালা, পশুপক্ষী সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করা চাই।" অন্যত্র "আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— "এই আশ্রমে গাছপালা, পশুপক্ষী যা কিছু আছে ছাত্রেরা তাদের সম্পূর্ণভাবে জানবে, এটা খুব দরকার। এখানে বাস করে অথচ তারা এদের লক্ষ্যগোচরই হয়না এরচেয়ে ক্ষতি আর কিছুই নেই। বাহিরের সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই এই-যে একটা

স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে তার দ্বারা আমাদের মনকে আমরা বঞ্চিত করি। আমাদের অধ্যাপনায় পুঁথিগত বিদ্যার পরেই আমাদের একান্ত সতর্কতা, কিন্তু কত বিদ্যা আমাদের চোখের কাছে, কানের কাছে, হাতের কাছে আমাদের মনোযোগের প্রতি অপেক্ষা ক'রে প্রত্যহই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাতে করে কেবল যে একটা দেশজোড়া চিত্তদৈন্য ঘটছে তা নয়, দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগের সম্পূর্ণতাও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।" উদ্ধৃতাংশগুলিকে শান্তি-নিকেতনে প্রকৃতিপাঠ ও ইন্দ্রিয়চর্চার বীজমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে এই বিশেষ শিক্ষারীতির বর্তমান চেহারাটিকে চিনে নেওয়া সম্ভব।

বর্তমান পাঠ্যক্রম এই ধারাটিকে নতুন করে সংগঠিত করবার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস। প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটের যে পরিবর্তন বর্তমান যুগে ঘটে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশ তথা প্রকৃতি সচেতনতা বর্তমান বিশ্বে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নর সংগে জড়িত একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষের অনুভূতির স্তরও পাল্টে গেছে। আলোচ্য পাঠ্যক্রম এই ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য না ঘটিয়ে তথ্যগতভাবে যুগোপযোগী করার চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান পাঠ্যক্রম সচেতনভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ। পাঠ্যক্রমের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিকও আছে। "শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি" রচনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা উল্লেখ করেছেন— "অর্থাভাববশত আমাদের বিদ্যালয়ে ফিজিক্‌স, কেমেষ্ট্রী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও পরীক্ষার যথোচিত সুযোগসাধন করিতে পারি নাই। কিন্তু এখানে উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও আবহবিদ্যার অনুশীলন সহজেই হইতে পারে"। বর্তমানে বিজ্ঞান-চর্চা বিদ্যালয় শিক্ষার একটি অন্যতম শাখা। আলোচ্য পাঠ্যক্রমের সংগঠন যাতে উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান চর্চার মূলস্রোতে ক্রমশঃ যুক্ত হয়ে যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রকৃতি পাঠ : পাঠ্যক্রমের প্রয়োগ

পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন সর্বদাই জীব জগতের অংশীদার হিসাবে আমাদের উদ্দীপ্ত করছে। শিশুরা তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সর্বদাই উৎসুক এবং স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত অভিজ্ঞতাকে একটা ছকে যোগাতে ও সংগঠিত (cataloguing and organising) করতে চায়। চারপাশের গাছপালা, প্রাণী, অজৈব বস্তু ইত্যাদি যা কিছু এরা "আবিষ্কার" করে তা কোন একটা ব্যবস্থায় সাজিয়ে ফেলার মধ্যেই তাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। ক্রমাগত অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে যেমন বৈজ্ঞানিকরা তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেন, তেমনই একটি শিশুর চিন্তা ও ধারণার সূত্রগুলি ক্রমশঃ বিভিন্ন অনুসন্ধানজাত অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে মূর্ত থেকে অমূর্ত আকার পায়। ঔৎসুক্য তথা চিন্তার পথগুলি ক্রমশঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ওঠে।

বর্তমান পাঠ্যক্রমে—প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান, ঔৎসুক্য, অনুসন্ধানমূলক অভিজ্ঞতা (investigative experience) এই তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা অনুসন্ধানমূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। অনুসন্ধান অর্থে এখানে পর্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যা ও তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য পাঠ্যক্রমে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা অবতারণার কোন সুযোগ নেই, একমাত্র বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়া। প্রতিক্রিয়া অর্থে এখানে বিভিন্ন ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে। ঘণ্টায় আঘাত করলে শব্দ হবে এবং ঘণ্টা অনুযায়ী শব্দের তারতম্য হবে। এই সম্পর্কের মধ্যে কোন অলৌকিক ব্যাপার নেই। ছাত্রছাত্রীরা এইরকম সহজ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করবে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করবে। ছাত্ররা ক্রমশ মূর্ত ধারণা থেকে অমূর্ত ধারণার পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শর্তগুলির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা সংগ্রহ করবে।

উদ্দেশ্যগতভাবে যে সব তাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল তা সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রয়োগের কোন অবকাশ বর্তমান পাঠ্যক্রমে নেই। পক্ষান্তরে, শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর পরিচয় ঘটানো যেতে পারে। বর্তমান

পাঠ্যক্রমের দুটি অংশ—ইন্দ্রিয় চর্চা ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ। প্রথম অংশে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ ক্ষমতা ও অনুভূতির তারতম্য অনুযায়ী শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে প্রযত্ন করা হয়েছে। কোন বাহ্যিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা তথা অনুধাবনের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির যথাযথ ব্যবহারে ছাত্রদের শিক্ষিত করতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী এই চার বছরে পাঠ্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে সরল থেকে জটিল ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। যেমন—বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ, পার্থক্য নির্ণয় ও শ্রেণীবিন্যাস একটি ক্রমপর্য্যায়। পক্ষান্তরে, পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা তথা উপাদানের মধ্যে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ নির্ণয় অন্য একটি পর্য্যায়। এইভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরবর্তী পর্য্যায়ে পরীক্ষা তথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তোলা বর্তমান পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য।

পরিবেশ সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার সামনে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপিত করা, শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলিকে সংহত করে একটি সরল ব্যবস্থায় উন্নীত করা, এবং পর্য্যায়ক্রমে সরল ব্যবস্থা থেকে জটিল ব্যবস্থার দিকে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা-ভাবনাকে উন্নীত করে, সমগ্র পরিবেশ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান তৈরী করে দেওয়াই এই সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকৃতিপাঠ সম্বন্ধীয় শিক্ষাদান স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত পরিবেশকে ব্যবহার করেই হবে। আশ্রমের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবহার করা বর্তমান পাঠ্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। আশ্রমের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে শিক্ষাদানের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার সূত্রে প্রকৃতিপাঠের শিক্ষককে আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে।

পাঠভবনের সামগ্রিক পাঠ্যক্রমে সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃতি-বিষয়ক উল্লেখ বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে। প্রকৃতিপাঠ শিক্ষাদানকালে শিক্ষক এই ব্যাপারে মনোযোগ রাখলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার একটা সামগ্রিক রূপ অনুভব করতে পারবে।

প্রথম অধ্যায় : দ্বিতীয় শ্রেণী

ইন্দ্রিয় চর্চা :

দৃষ্টি চর্চা—এই পর্যায়ে দৃষ্টি চর্চায় কেবলমাত্র বর্ণই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন শুদ্ধ ও মিশ্রিত বর্ণ দেখা যায়। পর্যায়ক্রমে শুদ্ধ ও পরে মিশ্রিত বর্ণের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে এই রকম পর্যায়রক্ষা সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ বর্ণ এবং মিশ্রিত বর্ণ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা প্রয়োজন।

উচ্চতার তুলনা—এই পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা গাছ, বাড়ী, নিজেদের উচ্চতা ইত্যাদির তুলনা করবে। প্রাথমিকভাবে দৃশ্যমান দুটি বস্তুর উচ্চতার তুলনা করবে, পরে দেখা কোন বস্তুর উচ্চতার তুলনা করবে। এই পর্যায়ে দৈর্ঘ্যের একক—ফুট, মিটার ইত্যাদি ব্যবহার করবার কোন অবকাশ নেই।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় চর্চা—এই পর্যায়ে সাধারণভাবে চোখ বন্ধ রেখে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ফুল, পাতা ও অন্যান্য বস্তুর গন্ধ শুঁকবে এবং গন্ধ দিয়ে ঐ বিশেষ ফুলটি অথবা পাতাটি চিনবার চেষ্টা করবে।

শ্রুতি চর্চা—বিদ্যালয়ের ঘণ্টা, মন্দিরের ঘণ্টা, পাখির ডাক, বাঁশি ইত্যাদি কানে শুনে উৎসের পার্থক্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অভ্যাস করবে। কোন শব্দ কোন দিক থেকে আসছে তা কাণে শুনে অনুমান করবে। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে লোকচেনা অভ্যাস করবে।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ :

সাধারণভাবে আশ্রমের গাছপালার সঙ্গে পরিচিতি—আশ্রমের বিভিন্ন রাস্তা ধরে হেঁটে রাস্তার দু-ধারের গাছপালা ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয় ঘটানো যায়। গাছের প্রচলিত নাম, পাতা, ফুল ও কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা, প্রসারতা ইত্যাদি এবং কোন বিশেষ চরিত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের পরিচয় করানো হবে। আশ্রমে আর কোথায় ঐ গাছ আছে সে সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অনুসন্ধান করবে। একই প্রজাতির গাছ একাধিকবার

বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেতে পারে সে ক্ষেত্রে দুটি গাছের বাহ্যিক চরিত্রের তুলনা করা যেতে পারে ; যেমন কোন গাছে বেশী ফুল, কোন গাছ বেশী বড় ইত্যাদি।

(দ্র. পরিশিষ্ট—১)

পাখী ও জন্তু পর্য্যবেক্ষণ—সাধারণভাবে যাতায়াতের পথে যে সব পাখী ও বড় বড় প্রাণী দেখা যায় তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে। মোটামুটি পাখী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেই পর্য্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। সাধারণভাবে, এদের প্রচলিত নাম, দেহের বৈশিষ্ট্য, খাদ্য, বাসস্থান. আচার-ব্যবহার ও সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অবহিত হবে। ক্ষেত্র বিশেষে পাখী ও প্রাণীদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রাণীদের নিয়ে প্রচলিত গল্প বলা যেতে পারে।

(দ্র. পরিশিষ্ট—৩)

ঋতু পরিবর্তন—উপরোক্ত দুটি বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণের পাশাপাশি ঋতু পরিবর্তন সংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ একটি সংশ্লিষ্ট বিষয়। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে যে সব পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে সেইসব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়া (রৌদ্র, বৃষ্টি ইত্যাদি) পরিবর্তন, জৈবজগতের উপর তার প্রভাব এবং বিভিন্ন ঋতুর ফুল সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

(দ্র. পরিশিষ্ট—২)

চারদিক ও হাওয়ার দিক পরিবর্তন :

প্রাথমিকভাবে চারদিক সম্বন্ধে (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ) সাধারণ ধারণা তৈরী করতে হবে। পরে অনর্গল প্রয়োগের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের দিকনির্ণয়ে পারদর্শী করে তুলতে হবে। রাস্তার দিক সম্বন্ধে অথবা কোনো গাছ, বাড়ি ইত্যাদির দিকনির্ণয় করতে বলা যেতে পারে।

হাওয়ার দিক-নির্দেশ সম্বন্ধে হাওয়া-মোরগ ব্যবহার করতে পারলে ভালো। অন্যথায় গাছের পাতা ইত্যাদি দেখে দিক-নির্দেশ করতে হবে। পথ চলাকালীন এইসব প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীরা দেবে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার দিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও ছাত্রছাত্রীরা অবহিত হবে এবং তার তাৎপর্য জেনে নেবে।

গুরুত্ব অনুমান—এই চর্চায় বিভিন্ন ওজনের বাটখারা ব্যবহার করে নির্দ্দিষ্ট ওজন সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করা দরকার। পরে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার না করেই ছোট বই, বাক্স, খাতা ইত্যাদির ওজন অনুমান করবে।

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ :

আকার, রং, গন্ধ, ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস—জীব ও জড়, প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন পর্য্যায়ের শ্রেণীবিন্যাসের প্রস্তুতি হিসাবে এবং বিভিন্ন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত ও একটি ছকে ফেলার অনুশীলনী হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা-ক্রমে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এই পর্য্যায়ে বিভিন্ন বস্তুকে আকার, রং, গন্ধ ও ওজন অনুযায়ী পৃথক করবে। সাধারণভাবে বাইরে ক্লাসে চলাকালীন মুখে মুখে এই ধরণের অনুশীলনী করানো যেতে পারে। দুটি বস্তুকে পৃথক করার ক্ষেত্রে অথবা একই ভাগে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা কি ধরণের যুক্তি প্রয়োগ করছে সেইদিকে নজর রাখা দরকার।

খসড়া খাতা (Scrap book) ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য ও সাযুজ্য ছকের মাধ্যমে লিখে ফেলা যেতে পারে।

জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য— জড় ও জীবের মধ্যে যে সাংগঠনিক তফাৎ আছে সেই সম্বন্ধে বিশদভাবে এই পর্য্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জানানো সম্ভব হয়। সাধারণভাবে জড় ও জীবের মধ্যে কার্য্যগত পার্থক্য— যেমন চলন, বৃদ্ধি, জনন, উত্তেজনা ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করানো যেতে পারে। জৈব ব্যবস্থার (Living system) বিচিত্র কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করানো যেতে পারে যেমন— কাণ্ডের কাজ, মূলের কাজ, পাতার কাজ, ছোটখাটো পোকা-মাকড়ের ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি (পরিশিষ্ট—১ দ্রষ্টব্য)।

মোটামুটিভাবে জড় ব্যবস্থার তুলনায় জৈব ব্যবস্থার ক্রিয়াকর্মের বিপুল বৈচিত্র্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া জড় জগৎ থেকে বস্তু ও শক্তি আহরণ করে জীব জীবনধারণ করে এবং মৃত্যুর পর জীব জড়ে পরিণত হয়— এ বিষয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাতা, ফুল, শিকড়, কাণ্ডের বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ—পূর্বোক্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে প্রথমে একটি আদর্শ পাতা, আদর্শ ফুল, কাণ্ড ও শিকড়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের

পরিচয় করাতে হবে (কোনরকম বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জটিলতা বাদ দিয়ে)। ফুল ও পাতার বিভিন্ন অংশের নাম হিসাবে সাধারণভাবে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু, বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন গর্ভমুণ্ড, গর্ভকেশর ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার চলতে পারে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন— শব্দটি ছাত্রছাত্রীরা যেন সহজেই ব্যবহার করে। সবক্ষেত্রে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলা সম্ভব নাও হতে পারে। সেইক্ষেত্রে অপরিচিত ও নতুন শব্দ হিসাবেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। কথপোকথনের মধ্যে নতুন শব্দের অনর্গল প্রয়োগের মধ্যে শব্দটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে যেমন পরিচিত করে তুলতে হবে ঠিক তেমনই ছাত্রছাত্রীরা শব্দটি সহজভাবে ব্যবহার করছে কিনা সেই ব্যাপারেও সতর্ক থাকা দরকার।

ফুল, পাতা, কাণ্ড ইত্যাদির গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিচিত হবে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরণের ফুল ও পাতার নমুনা সংগ্রহ করবে। তাদের খসড়া খাতায় ছবি এঁকে অথবা ছাপ তুলে রাখবে। কাণ্ড ও পাতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছের কাছে গিয়ে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবে (পরিশিষ্ট—১ক)।

ক্ষুদ্র প্রাণী পর্য্যবেক্ষণ—বিভিন্ন ঋতুতে আশ্রমে বিচিত্র ধরণের ছোট ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা যায়। হেঁটে বেড়ানোর সময় ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে। মোটামুটিভাবে প্রাণীদের জীবনবৃত্তান্ত, প্রচলিত নাম, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করাতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের খাতায় প্রাণীর ছবি এঁকে নেবে ও তারিখ দেবে (পরিশিষ্ট—৩)। পোকামাকড় হাতে করে ধরার ব্যাপারে সাবধান থাকা একান্ত দরকার। বিষাক্ত পোকামাকড় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করাতে হবে। আবার অহেতুক ভয় যাতে না জন্মায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

পৃথিবী ও আকাশ—পৃথিবীর আকার এবং কিভাবে দিন ও রাত্রি হয় ছাত্রছাত্রীরা জানবে। রাত্রের আকাশে পৃথিবীর তারা ও চাঁদ সম্বন্ধে জানবে। পূর্ণিমায় চাঁদের পুরোটা দেখা যায়, অমাবস্যায় দেখা যায় না। সূর্যের দৈনিক গতিপথ সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা লক্ষ্য করবে। কোন্ কোন্ উৎসব অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়, তার তালিকা তৈরী করবে। রাত্রের আকাশে অন্ততঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলকে চিহ্নিত করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আমরা নির্ভর করি। মাটি থেকে পাই দৈনন্দিন খাদ্য— চাল, গম, আলু, সব্জী, ফলমূল ইত্যাদি। পোষাক-পরিচ্ছদ পাই তুলা থেকে আর আমাদের আশ্রয়— বাড়ীঘরের আসবাব ও কাঠামো— পাই গাছ থেকে। তাছাড়া জীবনধারণের জন্য চাই জল ও বাতাস। মাটি, গাছপালা, জল ও বাতাস আমাদের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ যার উপর আমাদের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। এই অপরিহার্য্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হওয়া দরকার। এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে হবে। তিনটি পর্য্যায়ে এই আলোচনার ক্রমবিকাশ করতে হবে (পরিশিষ্ট—৪)।

বস্তু ও গতি—এই অংশে শক্তি-সম্বন্ধীয় পাঠের প্রাথমিক চর্চা হবে। শক্তি প্রয়োগে কোনো ভারী বস্তু কিভাবে সরে, ধনুক বা গুলিতে কিভাবে বস্তুকে দূরে ছুঁড়ে দেয় ইত্যাদি সহজ বিষয়ের অবতারণা করে ছাত্রছাত্রীদের শক্তির ব্যবহার এবং গতি সম্বন্ধে জানাতে হবে।

দশদিক ও হাওয়ার দিক পরিবর্তন—দিকনির্ণয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে পাঠ দেওয়া হয়েছে বর্তমান পাঠ তারই অনুসারী। এই বর্গে প্রাথমিক চারটি দিক ছাড়া বাকী দিক-গুলি অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক এবং ভারতীয় মতে উর্দ্ধ ও অধঃকোণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে (অগ্নি, বায়ু, ঈশান ও নৈঋত-কোণ শব্দগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে)। ছাত্রছাত্রীরা নতুন যে সব দিক চিনলো, তার সাপেক্ষে হাওয়ার দিক নির্দেশ করবে। বলা বাহুল্য, এই পাঠটিও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুসারী।

মেঘ ও বৃষ্টি—বৃষ্টির সাধারণ কারণ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের জানাতে হবে যে, মেঘ বৃষ্টির আধার, মেঘ জলীয় বাষ্প দিয়ে তৈরী। ঐ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়। বছরের সব সময় মেঘ দেখা গেলেও সব সময় বৃষ্টি পড়ে না, আবার বছরের কোনো কোনো সময় বৃষ্টি পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। বিশেষ করে, গ্রীষ্মের শেষদিকে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বর্ষায় প্রকৃতির পরিবর্তনে বৃষ্টির ভূমিকাও আলোচনা করতে হবে। বৃষ্টির জল মাটির ভেতরে প্রবেশ করা এবং খাল, পুকুর, ও নদীকে এবং শেষে সমুদ্রকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারেও উল্লেখ করতে হবে।

দেহ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য—ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রম ও ক্লান্তির সঙ্গে ক্ষুধার সম্পর্ক আলোচনা করে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের খাদ্যতালিকা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রে খাদ্যের শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। এই স্তরে খাদ্যকে মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করতে হবে।— শক্তিকারক (কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট সমৃদ্ধ), বৃদ্ধিকারক (প্রোটিন সমৃদ্ধ) এবং ভিটামিন ও খনিজ লবণ। ছাত্রছাত্রীরা তাদের খাদ্যকে এই তিনভাগে ভাগ করবে (ছকের নমুনা, পরিশিষ্ট—৫)।

ছাত্রছাত্রীরা দাঁত, কান, নাক ও চোখের কাজ ও উপকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হবে। ছাত্রছাত্রীরা আয়নার সাহায্যে নিজেদের দাঁতের ছবি আঁকবে। দাঁত, কান, নাক ও চোখের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে অবহিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ চতুর্থ শ্রেণী

ইন্দ্রিয় চর্চা :

দৃষ্টি চর্চা—পূর্বপাঠের ধারাবাহিকতায় বর্তমান পাঠ্যক্রমে রাস্তার এক স্থান থেকে অন্য স্থান, ফুটবল মাঠ, টেনিস কোর্ট ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত বেশী দৈর্ঘ্যের পরিমাপ অনুমান করার চেষ্টা করবে। অনুমান করবার জন্য ছাত্ররা একবার হেঁটে দেখে নিতে পারে। পরিমাপের শেষে অনুমান সাপেক্ষ মাপ ও প্রকৃত মাপের তুলনা করে নিজের অনুমানের সঠিকতা যাচাই করবে।

উচ্চতা অনুমান—পূর্বপাঠের ধারাবাহিকতায় বর্তমান পাঠ্যক্রমে অপেক্ষাকৃত উঁচু বস্তুর উচ্চতা সম্বন্ধে অনুমান করবে, যেমন—বাড়ী, লাইট পোষ্ট, উঁচু গাছ ইত্যাদি। প্রকৃত মাপ জেনে অনুমানের সঠিকতা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জেনে নেবে।

গভীরতা অনুমান- উচ্চতা অনুমান অপেক্ষা গভীরতা অনুমান একটু কঠিন। গভীরতার নির্ভুল অনুমান একটু বেশী অনুশীলন সাপেক্ষ। চৌবাচ্চার গভীরতা কত? বিভিন্ন কূয়ার গভীরতা কত? পাড় থেকে পুকুরের জলের উপর পর্য্যন্ত গভীরতা কত ইত্যাদি অনুমান সাপেক্ষে পরিমাপ করতে হবে।

সংখ্যা অনুমান—প্রথমে বড়, পরে ছোট বস্তু নিয়ে সংখ্যা অনুমান করবে। মার্বেল, পয়সা, পাথরকুচি অথবা বীজ প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা গুনে নেবে তারপর একনজরে দেখে কতগুলি আছে সে সম্বন্ধে অনুমান করবে। প্রকৃত সংখ্যা এবং অনুমানের মধ্যে তফাৎ ছাত্রছাত্রীরা জেনে নেবে। স্তূপীকৃত জিনিস ঢাকা দিয়ে অল্পক্ষণ দেখে ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যা অনুমান করবে। ঐ জিনিস এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে তার সংখ্যা অনুমান করবে। Library-তে শেল্‌ফে কত বই আছে অথবা ক্লাসে কতজন ছাত্রছাত্রী আছে অথবা মেলার মাঠে কতজন আছে সে সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অনুমান করবে।

শ্রুতি চর্চা—হারমোনিয়াম অথবা এস্রাজ থেকে সুর বার করে কোন সপ্তকের সুর সেটা অনুমান করতে হবে। পরে বিভিন্ন স্বরস্থান চিনতে হবে। এই অভ্যাস হয়ে গেলে

বিদ্যালয়ের ঘণ্টা, মন্দিরের ঘণ্টা, কলের বাঁশি, কোকিলের কণ্ঠস্বর, বাঁশের বাঁশি, পিতলের বাঁশি থেকে কোন স্বর বের হল তা অনুমান করতে হবে। এস্রাজ, হারমোনিয়াম, সেতার, বেহালা, সরোদ ইত্যাদির স্বর চিনতে হবে।

স্পর্শেন্দ্রিয় চর্চা—গরম বস্তুর তাপ, দেহের তাপ, বায়ুর উষ্ণতা অনুমান করবে। জিহ্বার সাহায্যে মিষ্ট, অম্ল, ক্ষার, কটু, কষায় ইত্যাদির স্বাদ পরীক্ষা করবে।

গুরুত্ব অনুমান—পূর্বপাঠের ধারাবাহিকতায় বর্তমান পাঠে ক্রমশ বেশী ভারী বস্তুর গুরুত্ব অনুমান করবে। গুরুত্ব অনুযায়ী বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস করবে।

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ :

বৈচিত্র্য অনুয়ায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্য্যবেক্ষণ এবং শ্রেণীবিন্যাস—পূর্ববর্তী পর্য্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে সব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছে, বর্তমান পর্য্যায়ে সেইসব পর্য্যবেক্ষণকে শ্রেণীভুক্ত করবে (পরিশিষ্ট—১ ক)।

ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সংগৃহীত নমুনাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করবে এবং পরে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে, ঋতু-পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রকৃতিতে যে ফুল, পাতা ইত্যাদি প্রাপ্তির পরিবর্তন ঘটে সে ব্যাপারেও ছাত্রছাত্রীরা দৃষ্টি রাখবে। বছরের শেষে খসড়া খাতা থেকে এর একটা তালিকা তৈরী করবে।

একইভাবে, ছাত্রছাত্রীরা পোকামাকড় যা দেখবে সেইসব শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা করবে। এইসব শ্রেণীবিন্যাস বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসের বিচারে সঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু যুক্তি প্রয়োগের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের তৈরী শ্রেণীবিন্যাসটিকে নিখুঁত করে তুলতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্ভব হলে ছাত্রছাত্রীদের তৈরী শ্রেণী-বিন্যাস যাতে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসের কাছাকাছি যেতে পারে সেই ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করা যেতে পারে।

জীবের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচয়—এই শীর্ষকে ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেইসূত্রে জনসংখ্যা (Population) সম্বন্ধে জানবে। সরাসরিভাবে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত না করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, যেগুলি একত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করবে।

প্রথমতঃ ফুল সম্বন্ধে যে প্রাথমিক পাঠ পূর্ববর্তী পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা পেয়েছে তারই উপর ভিত্তি করে ফুল থেকে ফল তৈরী হওয়া সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জানবে, বাইরে ক্লাস চলাকালীন যে কোন ফুলের গাছে ফুল ফোটার দশা থেকে তৈরী হওয়ার দশা সহজেই দেখানো যেতে পারে। এই সূত্রে পরাগসংযোগ, পরাগসংযোগের বিভিন্ন অবস্থা, পরাগ-সংযোগের বিভিন্ন প্রাণীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। এই এলাকার মধ্যে ছাতিম, শিমূল, মাধবীলতা, বট, শিরীষ, পাতা বাদাম, কাশ, কুশ ইত্যাদি উদ্ভিদ দেখিয়ে এই ব্যাপারে আলোচনা সম্ভব।

দ্বিতীয় ধাপে, ফলের মধ্যে বীজ বার করে দেখিয়ে বিভিন্ন বীজের গড়ন, সংখ্যা ইত্যাদিও দেখানো হবে। আশ্রমের চারপাশে বর্ষা থেকে শুরু করে বর্ষার পরের মাস-গুলিতে বিভিন্ন গাছের বীজ বিশেষ করে কুর্চি, ছাতিম, জুঁই ইত্যাদি গাছের বীজ অঙ্কুরোদ্গমের বিভিন্ন দশা দেখতে পাওয়া যায়। কোন একটি গাছ অথবা এলাকা নির্দিষ্ট করে রাখলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম ও প্রাথমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন দশা ক্রমান্বয়ে দেখানো সম্ভব।

ছাত্রছাত্রীরা এই পাঠ চলাকালীন তাদের খাতায় ছবি এঁকে তারিখ দিয়ে বিবরণ লিখে রাখবে। কথায় লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও ক্রমপর্যায়ে ছবি এঁকেও বিবরণ রাখা যেতে পারে। এই পর্যায়ে ফল প্রতি বীজের সংখ্যা ও গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা তথা গাছপ্রতি বীজের সংখ্যা, গাছপ্রতি নতুন চারা জন্মানোর সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সহজ পাটিগণিতের নিয়মে অঙ্ক কষে বার করবে। অঙ্কের ফলাফল থেকে জীব জগতে সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা সম্বন্ধে আঁচ করবে। বলাবাহুল্য অঙ্ক কষবার সময় কোনো কাল্পনিক মান ধরে নেওয়ার বদলে কোন একটি বিশেষ গাছ ধরে নিয়ে তার বীজ, ফল ইত্যাদির সংখ্যা গুনে নেওয়াই ভালো। কোন গাছে ফলের সঠিক সংখ্যা গুনে ফেলা সম্ভব নাও হতে পারে— সেই ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যা অনুমান করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ (মাটি, পাথর ও খনিজ)—মাটি থেকে আমরা পাই খাদ্যের সংস্থান। আবার মাটি অনেক প্রাণী ও গাছপালাকে আশ্রয় দেয়। নানা ধরণের ব্যাক্টেরিয়া, কেঁচো, ছোট ছোট পোকামাকড়, এছাড়া অনেক প্রাণী ও গাছপালা মাটির ওপর ও মাটির মধ্যে বাস করে। ছাত্রছাত্রীরা নানাধরণের মাটির নমুনা এনে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ছোট ছোট জীবাণু দেখবে। একটি পাত্রে মাটি রেখে কেঁচোর দৈনিক প্রকৃতি ও আচরণ লক্ষ্য করবে। মাটিতে যে সব প্রাণী বাস করে তাদের তালিকা করবে।

ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন মাটি, পাথর ও বালির নমুনা সংগ্রহ করবে। পাথর থেকে মাটি ও বালির উৎপত্তি জানবে।

বাতাস ও জলের প্রভাবে মাটির ক্ষয়ের পরীক্ষা দেখানো যায়। গাছপালা মাটির শক্তিবৃদ্ধি কিভাবে সাহায্য করে তা পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। সাধারণভাবে মাটির অবক্ষয়ের ধারণা এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়ের ধারণা দেওয়া চলে। মাটির জল ধারণের (ground water) ক্ষমতা আলোচনা করা যায়।

মাটি অবক্ষয়ের সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতা বিনাশের সম্পর্কের ইঙ্গিত দেওয়া প্রাসঙ্গিক (পরিশিষ্ট—৪)।

জৈব ও অজৈব বস্তু সংগ্রহ ও পর্য্যবেক্ষণ—ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করবে। ফুল, পাতা, পালক ইত্যাদি জমিয়ে খাতায় আটকে রাখতে পারে। আবার পাথর, পোকামাকড়, পাখির বাসা, গাছের ছাল, বীজ, ফল, ইত্যাদি অন্যভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। বিভিন্ন নমুনার ছবি এঁকে অথবা ছবি সংগ্রহ করে Scrap book তৈরী করতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষকশিক্ষিকা যথাযথ নির্দেশ দেবেন।

দেহ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য—পঞ্চেন্দ্রিয়, যথা— চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অবহিত হবে। পৌষ্টিকতন্ত্র সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং সরলীকৃত আলোচনার সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ ও পুষ্টির শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা জানবে। ছাত্র-ছাত্রীরা ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে অথবা অন্যভাবে একে অন্যের হৃৎস্পন্দন শুনবে এবং নাড়ী দেখতে শিখবে, নাড়ীর স্পন্দনের হার গুনবে। একইভাবে শ্বাসকার্য্য সম্বন্ধে প্রাথমিক পাঠের পর শ্বাসকার্যের হার গুনবে। বিভিন্ন শারীরিক পরিশ্রমের সাপেক্ষে শ্বাসকার্যের ও হৃৎস্পন্দনের হার গুনবে, তুলনা করবে ও তালিকা প্রস্তুত করবে (পরিশিষ্ট—৬)।

আমাদের সাপ্তাহিক খাবারের রান্না করার প্রয়োজন সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জানবে (স্বাদ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজন)। রান্নার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা হবে, যথা— ভাজা, সেদ্ধ, ভাপানো, পোড়ানো ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত রান্না এবং বেশী তেল ও মশলা প্রয়োগের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করবেন। খাওয়ার জায়গা, রান্নার জায়গা, পাত্র ইত্যাদির পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বাসি খাবার খাওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা হবে। বিশেষ করে খাদ্য নষ্ট করা এবং অতিরিক্ত ভোজনের কুফল সম্বন্ধেও আলোচনা করতে হবে।

পরিধেয় বস্ত্র— বিভিন্ন ঋতুতে পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। কৃত্রিম তন্তু দ্বারা বস্ত্র এবং তূলাজাত বস্ত্রের পার্থক্য এবং পরিধানের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা হবে।

শক্তি ও কাজ—শক্তি ভিন্ন কোনো কাজ সম্পন্ন হয়না — এই আলোচনা অন্তে শক্তির বিভিন্ন উৎস এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জানবে ও বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহৃত শক্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। ছোটোখাটো অভিজ্ঞতা, যেমন— হাতে হাতে ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জানবে (পরিশিষ্ট—৯)।

পৃথিবী ও গ্রহ—সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জানবে। খোলা চোখে রাতের আকাশে গ্রহ এবং নক্ষত্র চিনবার উপায় সম্বন্ধে তারা জানবে। বিভিন্ন গ্রহের নাম এবং কালপুরুষের অবস্থান জানবে। পৃথিবীর বার্ষিক এবং আহ্নিক গতি সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

চতুর্থ অধ্যায় : পঞ্চম শ্রেণী

ইন্দ্রিয় চর্চা :

বিস্তার—বর্গইঞ্চি, বর্গফুট, বর্গমিটার কতটা জায়গা সেটা ছাত্রছাত্রীরা বুঝে নেবে। ফুলস্ক্যাপ, ডিমাই ইত্যাদি কাগজের বিস্তার মেপে দেখে নেবে। পরে ঘরের বিস্তার, বাগানের বিস্তার অনুমান করবে। কাঠা ও বিঘার হিসাব জেনে বড় চৌকো জমির বিস্তার অনুমান করবে (৪০ গজ লম্বা, ৪০ গজ চওড়া জমিকে বিঘা বলে এবং ২০ কাঠায় এক বিঘা হয়)। অনুমান কতদূর সঠিক সেটা জানবার জন্য ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃত মাপ জেনে নেবে।

ঘন চর্চা—আয়তন অনুযায়ী এক লিটার জল কতটা জায়গা জুড়ে থাকে সেটা জেনে নিয়ে ক্রমশঃ বেশী আয়তন পরিমাপ করবে।

সময় অনুমান—এক মিনিট, তুই মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট সময় কতটা ঘড়ি দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা অনুমান করতে শিখবে। পরে ঘড়ি ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা সময় সম্বন্ধে আন্দাজ তৈরী করবে। এক স্থান থেকে অন্য স্থান যেতে এবং ফিরে আসতে কত সময় লাগলো অনুমান করবে। সাইকেল, গরুর গাড়ী, মোটর বা পদচারীর গতি দেখে ঘণ্টায় কত মাইল বেগে চলছে অনুমান করবে। অল্পক্ষণের জন্য নাড়ীর স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা দেখে মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা কত সেটা অনুমান করবে।

কোণের পরিমাণ অনুমান—ঘরের কোণ, বই, খাতার কোণ প্রায়ই এক সমকোণ থাকে। সমকোণের ধারণা তৈরী হ'লে সমকোণের ভগ্নাংশ অথবা যুক্তফলের সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করবে। এই অনুমান অভ্যস্ত হলে, ছাত্রছাত্রীরা কোন গাছ মোটা, মাটির সঙ্গে কত ডিগ্রী কোণে হেলে আছে সেটা অনুমান করবে। এইসব অনুমান শেষে কোন নির্দিষ্ট সময়ে চাঁদ, সূর্য্য বা বিশেষ গ্রহ ও নক্ষত্র যাম্যোত্তর (Meridian) থেকে কত ডিগ্রী কোণে অবস্থান করছে— অনুমান করতে শিখবে।

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ :

দেহ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য—আমাদের দেহে অস্থির প্রয়োজনীয়তা এবং দেহের বিভিন্ন অস্থি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জানবে। একইভাবে পেশীর সম্বন্ধেও ছাত্রছাত্রীরা জানবে। মস্তিষ্কের কাজ কি ? এবং কিভাবে কাজ করে ? সারা দেহের স্নায়ু ব্যবহার সাপেক্ষে ছাত্রছাত্রীরা জানবে। ছাত্রছাত্রীরা দেহের কার্য্যক্ষমতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে জানবে এবং সারাদিনের খাদ্যতালিকার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের উপস্থিতি তালিকাবদ্ধ করবে (পরিশিষ্ট—১০)।

সাধারণ পুষ্টিতালিকা দেখে ছাত্রছাত্রীরা তাদের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানবে (পরিশিষ্ট ১০ ক)। ভিটামিন কি ? এর প্রয়োজনীয়তা এবং উৎস সম্বন্ধে জেনে, ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাত্যহিক খাদ্যে ভিটামিনের উপস্থিতির তালিকা প্রস্তুত করবে (পরিশিষ্ট—১১)।

উদ্ভিদের পুষ্টি কি ? সারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা জানবে। মাটির খনিজ লবণ ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান এবং রৌদ্র, বাতাস ও জল উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহায়ক। পরীক্ষা দ্বারা দেখানো যায় খনিজ লবণের অভাবে ও আধিক্যে কিভাবে উদ্ভিদের ক্ষতি হয়। জৈব সার ও কৃত্রিম সারের অবতারণা করা হবে এবং শস্য উৎপাদনে তাদের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে হবে।

বিভিন্ন উৎস থেকে কি কি জীবাণু আমাদের দেহে কি কি রোগের সঞ্চার করতে পারে, এই ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা জানবে এবং অনুশীলন করবে (পরিশিষ্ট—১২)। রোগ প্রতিরোধে কোন কোন ব্যবস্থা, যেমন প্রতিষেধক টীকা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে সে সম্বন্ধে তারা জানবে (পরিশিষ্ট—১৩)। চোখে ধূলো ঢোকা, কানে পোকা ঢোকা, কেটে যাওয়া ইত্যাদির সাধারণ চিকিৎসা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অবহিত হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ (বাতাস ও জল)—আমাদের প্রাণধারণের জন্য বাতাস ও জলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীরা জানবে (পরিশিষ্ট—৪ গ)।

বাতাসের উপাদান ও প্রাকৃতিক ধর্ম বর্ণনার পর কয়েকটি সহজ পরীক্ষা— যেমন, বাতাসের শূন্যস্থান পূর্ণ করার প্রবণতা, অক্সিজেনের (O_2) দহনকার্য্যে সাহায্য করার ক্ষমতা ইত্যাদি দেখানো যেতে পারে। বায়ুদূষণ কীভাবে ঘটে ? তার প্রতিকার কী ? এইসব সমস্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যায়।

সংকল্প নিতে হবে। গাছপালা তথা বনসম্পদ উচ্ছেদের কুফল, যেমন ভূমি অবক্ষয়, স্বল্প বৃষ্টিপাত, বন্যার প্রকোপ ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বনসম্পদ ও জলসম্পদ সংরক্ষণের মৌলিক উপায়গুলির অবতারণা করে পরিবেশ সংরক্ষণের মূল ধারণা দেওয়া যায়। পরিবেশ সংরক্ষণের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই তথ্যটিও ছাত্রছাত্রীদের মনে বদ্ধমূল হওয়া দরকার।

পরিবেশের গঠন—পূর্ববর্তী পাঠ থেকে বিশেষতঃ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, খাদ্য-জল, জল-চক্র, $CO_2 - O_2$ চক্র সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা যে খাদ্যজালের ছক তৈরী করেছে, তাকেই বিভিন্ন উপাদানের সাপেক্ষে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। যথাক্রমে অজৈব বস্তু, উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজক এই চারটি শ্রেণীতে সমস্ত উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে। পরিভাষা ব্যবহারে ছাত্রছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করে তোলার সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা উল্লেখ করতে হবে। প্রথম তিনটি উপাদান সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই পরিচিত হবে। কিন্তু বিয়োজক সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষিকা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে উপস্থাপন করবেন। অন্য তিনটি উপাদান যেমন অন্যদের সঙ্গে সরাসরি সরলরেখায় যুক্ত, বিয়োজক তেমন নয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিয়োজক, খাদক ও উৎপাদক শ্রেণীর উপর ক্রিয়া করে এবং অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে ও চক্রটি পূর্ণ করে। এ ব্যাপারে উল্লেখ করতে হবে। উৎপাদক শ্রেণী সৌরশক্তি আবদ্ধ করে এবং জীবজগতে শক্তি সরবরাহ করে। এই তথ্যটি এই অংশে আলোচনা করে সরাসরি পরবর্তী অংশের শক্তি, কাজ ও খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ঃ

১। যে জায়গায় কোন জীব বাস করে সেটাই তার আবাস (habitat)। ব্যবহারের মাধ্যমেই 'habitat' পরিভাষার সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা জানাতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের কাছাকাছি বিভিন্ন 'habitat' তথা আবাস এর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করাতে হবে।

৩। জীব ও পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ে বোধ সৃষ্টি করতে হবে।

আগের পর্য্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করেছে। বর্তমান পাঠে তারা লক্ষ্য করবে যে, সব বীজ সব জায়গায় গাছ হয়ে জন্মায় না। আবার স্থান বিশেষে গাছ ও প্রাণীর বৈচিত্র্য বদলে যায়। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের চারপাশে

উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাস খুঁজবে। এই ধরনের বাইরের ক্লাস চলাকালীন, এলাকা তথা কতটা জায়গা জুড়ে ছাত্রছাত্রীরা খুঁজবে সেটা আগে থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার। শান্তিনিকেতনের পরিবেশে অল্প একটু জায়গা বেছে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা দৌড়বে কম, খুঁজবে বেশী। এইরকম অনুসন্ধানের পর্ব শুরু হওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীরা কত রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং তাদের আবাসকক্ষ দেখতে পায়, তার একটা হিসাব রাখার কথা বলে দিতে হবে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ পরিচিতি তৎক্ষণাৎ সম্ভব না-ও হতে পারে। সেই সব ক্ষেত্রে একটা আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিচিতি তৈরী করতে হবে; যেমন—হলুদ বড় পোকা, সবুজ পোকা অথবা ছোট বেগুনি ফুল, ঘাস ইত্যাদি। বিভিন্ন উদ্ভিদ লক্ষ্য করা খুব সহজ হলেও, প্রাণী লক্ষ্য করা সবসময় সহজ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, গাছের গোড়া, পাতা, ফুল ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে। চাপা পাথর সহসা না সরানোই ভালো। তলায় বিছা বা অন্যান্য ক্ষতিকর পোকামাকড় থাকতে পারে। অনুসন্ধান পর্ব শেষ হলে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন প্রাণীর আবাস সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া গেল সেগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলোচনা চলাকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকা আবাসের বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করবেন, বিশেষ করে যেগুলি স্বাভাবিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। যেমন— খেলার মাঠের ধারে যত ঘাস ও পোকা পাওয়া যাবে, ক্রমশঃ মাঠের ভিতরের দিকে গেলে ততো ঘাস বা পোকা পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে বড় গাছের ছায়া, বর্ষার জলের গতিপথ ইত্যাদি সম্ভাব্য পরিবেশের শর্তগুলির প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের পাঠ বিভিন্ন পর্বে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশ ছাত্রছাত্রীরা নেবে। পরিবেশের তথা আবাসের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা হবে। এই সূত্রে আবাস তথা পরিবেশের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের একটা প্রাথমিক ধারণা জন্মাবে। পাঠ সমাপ্তির আগে মরুভূমি, মেরু অঞ্চল, নিরক্ষীয় অঞ্চল, সমুদ্র ইত্যাদি ভৌগোলিক আবাস সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে সম্ভব হলে ছবি দেখিয়ে আবাসের সম্ভাব্য বৈচিত্র্য এবং সেইসব জায়গায় স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমনভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছবি দেখিয়ে পরিবেশ-জীব সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে, এবং পরিবেশে প্রভাবশালী উপাদানগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হবে, যেমন— বাতাস, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরতা ইত্যাদি।

জৈব-অজৈব বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় :

খাদ্য-জাল—আবাসে খাদ্যপ্রাপ্তির সম্ভাব্যতা একটি অন্যতম পারিপার্শ্বিক উপাদান।

ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রাণীর আবাস সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান আগে চালিয়েছে তার প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে লিখবে (পরিশিষ্ট—১৭)। বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে কোথায় মিল সেটা শিক্ষক-শিক্ষিকা দেখিয়ে দেবেন, যেমন— অনেক পোকাই ঘাস খায়, আবার সব পোকাই ব্যাঙের খাদ্য। ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত তথ্য সাজিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা বোর্ডে খাদ্য-জালের (Food-web) একটি ছবি আঁকবেন। উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা অজৈব পদার্থের নাম লিখবেন। উদ্ভিদের পুষ্টি উৎপাদন হিসাবে মাটি, জল ইত্যাদির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সাধারণভাবে অবহিত করবেন।

পরবর্তী পাঠে ছাত্রছাত্রীরা সম্ভাব্য খাদ্য-খাদক ছক নিজেরাই তৈরী করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা কেবল তত্ত্বাবধান করবেন। এই রকম ছক তৈরীর ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা যাতে ঐ ছকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে সে ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। এই রকম ছকে বিভিন্ন প্রাণীর নাম লেখার সময় তার আবাস সম্বন্ধেও উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যাভ্যাসকে শাকাশী ও মাংসাশী, এই দুইভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেসব পরিভাষা প্রয়োগ করা হলো, সেগুলি ছাত্রীছাত্রীরা অনায়াসে ব্যবহার করছে কিনা সেই ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

জলচক্র—খাদ্য-খাদক সম্পর্ক এবং আবাস সম্বন্ধীয় পাঠে, আবাসে জলের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবেশে জলচক্রের স্বাভাবিক আবর্তন সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী অংশে, ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জল ও জীব জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিচিত করানো হবে। প্লাষ্টিক থলির মধ্যে সজীব গাছ, পোকা ইত্যাদি রাখলে একদিন পরে থলির গায়ে জলবিন্দু দেখা যাবে। ঐ জল জীবের শরীর থেকেই বেরিয়েছে— এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, জল ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচে কিনা এই ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন ক'রে, সবিশেষ আলোচনা করবেন। ছাত্রছাত্রীরা জলচক্রের ছবি আঁকবে। পাহাড়, নদী, পুকুর, সমুদ্র, উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদির উল্লেখ করবে।

অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড চক্র—পরিবেশ অজৈব বস্তুর ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশের মধ্যে অজৈব বস্তুর চক্রাকারে জৈব ও

অজৈব বস্তুর জগতে পরিভ্রমণের ইঙ্গিতও করা হয়েছে, জলচক্রের মাধ্যমে। বর্তমান পাঠে পরিবেশের মধ্যে CO_2 ও O_2 চক্র সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা হবে।

প্রাথমিকভাবে জৈব জগতে CO_2 ও O_2-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জানানো হবে। নিঃশ্বাসবায়ু হিসাবে আমরা O_2 গ্রহণ করি এবং প্রশ্বাসবায়ু হিসাবে CO_2 ত্যাগ করি। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে CO_2 গ্রহণ করে ও O_2 ত্যাগ করে। এই পর্যায়ে, জীবদেহে CO_2 ও O_2-এর ভূমিকা সম্বন্ধে আর বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, বায়ুমণ্ডলে CO_2 ও O_2-এর ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অবদান ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পরিবেশে CO_2 ও O_2 চক্র সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য একটি বিশদ পাঠের অবতারণা করা হয়েছে। পাঠটির অন্য মূল উদ্দেশ্য হলো— বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো।

সরাসরিভাবে, CO_2 ও O_2-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ব্রোমোথাইমল ব্লু (BTB) রাসায়নিক সূচকের ব্যবহার করা হবে। প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা BTB'র ক্রিয়াকলাপ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে BTB'র সাহায্যে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে CO_2 ও O_2-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিচিত হবে এবং শেষে CO_2 ও O_2 চক্র সম্বন্ধে জানবে।

Bromothymol Blue :

এই রাসায়নিক সূচক, দ্রবণ ও গুঁড়ো হিসাবে পাওয়া যায়। গুঁড়ো হিসাবে ব্যবহারের সুবিধা এই যে পরীক্ষাগারে প্রয়োজনমতো যে কোন ঘনত্বের দ্রবণ তৈরী করে নেওয়া সম্ভব। BTB দ্রবণের স্বাভাবিক রঙ নীল। এ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে ঐ নীল রঙ এ্যাসিডের তীব্রতা ও পরিমাণের মাত্রা অনুযায়ী প্রথমে সবুজ ও পরে হলুদ রঙে পরিবর্তিত হয়। প্রশ্বাসের CO_2-এর প্রভাবে BTB দ্রবণের রঙ পাল্টাবে। ভাল ফল পাওয়ার জন্য BTB দ্রবণে, প্রয়োজনমতো ভিনিগার বা অ্যামোনিয়া ঢেলে pH এমনভাবে ঠিক করতে হবে, যাতে অল্প প্রশ্বাসেই দ্রবণের রঙ পরিবর্তিত হতে পারে।

পরীক্ষা পদ্ধতি—প্রতি পরীক্ষার সময় একটি নিয়ন্ত্রিত (Control) ও একটি পরীক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আগেই ছাত্রছাত্রীদের কিছু না

বলে তাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের সন্দেহ নিরসনের জন্য ভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এই বিশদ পাঠের মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে পরিচয় হবে। যে যুক্তি এইসব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তৈরী হবে সেইসব যুক্তি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবার সময় ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক এ ক্ষেত্রে কেবল পর্যায়ক্রমে পরীক্ষার সামনে ছাত্রদের উত্থাপন করবেন।

১ম পরীক্ষা—

একটি কাপে BTB দ্রবণ নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা একটি নলের সাহায্যে ফুঁ দেবে। ক্রমশঃ রং পাল্টাবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সময় রং পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে জানতে চাইবেন। পরে ঘোষণা করবেন যে, ঐ পাত্রে BTB নামক এক রাসায়নিক দ্রবণ আছে যা CO_2-এর প্রভাবে রঙ পাল্টায়।

২য় পরীক্ষা—

একটি পাত্রে কেবল জল ও অন্য অকটি পাত্রের জলে নীল কালি ঢেলে পূর্বোক্ত পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা হবে। ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করে শিক্ষক BTB-এর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। জানানো হবে যে আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে CO_2 বেরিয়ে আসে। রাসায়নিক সংকেতের সাহায্যে (CO_2) কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক সঙ্কেতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই, CO_2 শব্দটির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হবে কেবলমাত্র।

৩য় পরীক্ষা—

পূর্বপরীক্ষা শেষ হলে CO_2 যুক্ত হলুদ BTB দ্রবণ একরাত্রি রেখে দেওয়া হলে দেখা যাবে যে—দ্রবণের রং আবার নীল হয়ে গেছে। এই রঙ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা যে সব উত্তর দেবে সেগুলি বোর্ডে লিখে রাখা যেতে পারে। প্রত্যেকটি উত্তরকে এক একটি Hypothesis হিসেবে গ্রহণ করে, সমস্ত Class-কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এক একটি দল এক একটি Hypothesis প্রমাণ করবে। এমন উত্তর আসতে পারে যে তাপমাত্রার জন্য এমন হয়েছে অথবা দ্রবণ থেকে CO_2 উড়ে গেছে ইত্যাদি। পরীক্ষার মাধ্যমে তারা এই সিদ্ধান্তে আসবে যে কোনো দ্রবণ থেকে গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে।

৪র্থ পরীক্ষা (ক)

প্রাণী কি CO_2 ত্যাগ করে ? এই পরীক্ষায় ছুটি পাত্রে নীল BTB দ্রবণ রেখে একটি পাত্রে একটি ছোটো জলজ শামুক রেখে দেওয়া হবে। অন্য পাত্রটি যথারীতি নিয়ন্ত্রিত হিসেবে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো শামুক থাকবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে যে ঢাকা দেওয়ার সময় যাতে বেশী বাতাস ওপারে না থাকে। ঐ বাতাস পরীক্ষার ফলাফলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। প্রথম দিন পরীক্ষা ঐভাবে রেখে লেবেল করে পর-দিন ফলাফল লক্ষ্য করতে হবে। ছুটি পাত্রের দ্রবণে রঙের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেবে।

৪র্থ পরীক্ষা (খ)

উদ্ভিদ কি CO_2 গ্রহণ করে ? এই পরীক্ষায় আগের পরীক্ষার (৪ক) মতো ছুটি পাত্রে BTB দ্রবণ নেওয়া হবে, তবে নিঃশ্বাস প্রয়োগ করে দ্রবণের রঙ সবুজ করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা পাত্রে শামুকের বদলে জলজ উদ্ভিদ দিতে হবে। পরীক্ষার ফলে দেখা যাবে অনেক পাত্রে দ্রবণের রঙ নীল হয়ে গেলেও কিছু পাত্রে দ্রবণের রঙ সবুজ থেকে যায়। ছাত্রছাত্রীরা আগের পরীক্ষার মতোই এই পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করবে।

৪র্থ পরীক্ষা (গ)

উদ্ভিদযুক্ত কিছু পাত্রে দ্রবণের রঙ সবুজ হলো কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ছুটি পাত্রের একটিকে কৃত্রিম আলোর সামনে রেখে এবং অন্যটিকে অন্ধকারে রেখে পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে—এই পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক অবস্থায় বিভিন্ন রঙের BTB দ্রবণ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। বর্তমান পরীক্ষার ফলাফল পূর্বোক্ত সূত্র অর্থৎ উদ্ভিদ CO_2 গ্রহণ করে এই তত্ত্বটিকে অস্বীকার করবে। পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা জানবে অন্ধকারে উদ্ভিদ CO_2 ত্যাগ করে এবং আলোয় CO_2 গ্রহণ করে।

পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতিতে CO_2 ও O_2 এর সম্পর্ক অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সাহায্য করবেন। এগিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রী এই পাত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণী রেখে BTB দ্রবণের সাহায্যে স্বাধীন ভাবে পরীক্ষা চালাতে পারে।

খাদ্য-খাদক সম্পর্ক :

খাদ্য-খাদক আলোচনায় খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। এই সূত্র সহজ পাটীগণিতের অঙ্কের সাহায্যে কোনো পরিবেশে খাদ্য ও খাদকের সংখ্যার ভারসাম্য সক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটানো সম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ :—ইঁদুর ও বিড়াল অথবা বাঘ ও হরিণের খাদ্য-সম্পর্ক খুব সরল খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট-সংখ্যক ইঁদুরের অথবা হরিণের ওপর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক বিড়াল অথবা বাঘ কতদিন বেঁচে থাকবে? এই ধরণের অঙ্কে ক্রমশঃ অন্যান্য শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। যেমন সংখ্যাবৃদ্ধি। পরবর্তী ধাপে ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশে যে সব খাদ্য-শৃঙ্খল অনুসন্ধান করেছে, সেইসব ব্যবহার করে শিক্ষকের নেতৃত্বে অঙ্ক তৈরী করবে। শিক্ষক এই প্রসঙ্গে পরিবেশে কোনো জৈব সদস্যের সংখ্যাধিক্য অথবা সংখ্যাল্পতা কিভাবে অন্য জৈব-সদস্যের জীবনধারণকে প্রভাবান্বিত করে সেই ব্যাপারে আলোকপাত করবেন।

পরিশিষ্ট—১
আশ্রমের গাছপালা

"আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। ……'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভূমিকা, "বনবাণী"।**

"……সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারিদিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথের সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে—দিনে রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠেছে বনে বনে পর্বতে প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দ্যুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে, 'আমি থাকব।'

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "বলাই"।**

মন্তব্য—শিক্ষক-শিক্ষিকারা "বনবাণী"র ভূমিকা এবং "বলাই" প্রবন্ধটি ছাত্রছাত্রীদের সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন। ছাত্রছাত্রীদের মনের উপর এর প্রভাব হবে অপরিসীম।

মহুয়া : মউল

Mahua

Madhuca indica Gmel
Fam : Sapotaceae
Flowering period : February-April

মধ্যভারত, গুজরাট, পশ্চিমঘাট বরাবর ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই গাছের স্বাভাবিক আবাস। উঁচু বড় আকারের পর্ণমোচী, ছড়ানো গাছ। শাখার শেষে গুচ্ছ গুচ্ছ পাতা (৭—২০×৩—৭ সেমি) ডিম্বাকৃতি। কচি অবস্থায় সামান্য লোমশ এবং শেষ পর্য্যন্ত লোমহীন। গ্রীষ্মে—মার্চ মাস নাগাদ গাছ পুষ্পিত হয়। সাদা রঙের ফুলে (২·৫—৩ সেমি) দলমণ্ডল ৮—১০টি, পরাগকেশর প্রায় ৫টি, লম্বা গর্ভদণ্ড। ফল শাঁসযুক্ত, রোমশ (৩—৫ সেমি লম্বা)। ডিম্বাকৃতি ফল প্রথমে সবুজ, পরে লালচে হলুদ বা কমলা রঙের। বীজ, ১—৪ সেমি পর্য্যন্ত। মহুয়া কাঠ শক্ত ও ভাল। মহুয়া ফুল রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। শুকনো ফুল ও পাকা ফল থেকে উৎকৃষ্ট মদ্য তৈরী হয়। বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর প্রিয় খাদ্য মহুয়া ফল। পাকা মহুয়া খেয়ে মাতাল ভালুকের গল্প প্রায়ই শোনা যায়। ভারতবর্ষে অনটনের সময় অনেক মানুষ মহুয়া খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে। মহুয়া বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল, আলো জ্বালানো বা রান্নার কাজ ছাড়া, বর্তমানে সাবান উৎপাদনে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আম

Mango—Am

Mangifera indica L.
Fam : Anacardiaceae
Flowering period : January-March

ভারতীয় জনজীবন ও সংস্কৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই আম গাছ প্রসারিত শাখাসহ বড় জাতের (৬—২০ মিটার) সুপরিচিত গাছ। শাখার পাতার শীর্ষদেশ ছুঁচালো এবং কিনারা ঢেউ

খেলানো। খুব ছোট ছোট ফুলগুলি মঞ্জরীতে একত্রে পুষ্পিত হয়। পুষ্পিত হওয়ার সময় ফেব্রুয়ারী-মার্চ। দলগুলির গোড়া হলুদ-সবুজ রঙের এবং পার্শ্বদেশে গোলাপী ও বেগুনী রঙের ছোপ থাকে। পরাগকেশর ৪-৫টি। একটি মাত্র কেশর উর্বর, বাকীরা বন্ধ্যা। উর্বর কেশরটি অন্যদের থেকে লম্বা। পূর্ণবিকশিত ফুল আড়াআড়িভাবে ৬-৮ মিমি দীর্ঘ। আঁটি যুক্ত ফলের গুণ নির্ভর করে— স্বাদ, সুগন্ধ, ও আঁশহীনতার উপর। আমের আকার সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডকার হলেও জাতিগতভাবে আকারের পরিবর্তন দেখা যায়। সব আম গাছের ফল খাদ্যোপযোগী নয়। ভারতবর্ষে আমের সাধারণতঃ দুটি প্রজাতি দেখা গেলেও, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬৫টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষেই প্রায় ৫০০ জাতের আমের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতের আমের সঙ্গে অন্যজাতের আমের চরিত্রের নির্দিষ্ট তফাৎ আছে। সাধারণভাবে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আমকে বিশেষজ্ঞরা প্রথম শ্রেণীর আম বলে চিহ্নিত করেন, সেগুলি হলো, পশ্চিমাঞ্চলে— আফুনজো, পাইরী; দক্ষিণাঞ্চলে— নীলাম, বাংগনেপল্লী; অন্ধ্রে—মালগোয়া, সুবর্ণরেখা; যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে— চৌসা, দশেরী ও ল্যাংড়া; পশ্চিমবঙ্গে— গুলাবখাস, হিমসাগর ও বোম্বাই। অন্ধ্রে টনেরু জাতের আম স্বাদে, গন্ধে তেমন কিছু না হলেও লম্বায় ২৩ সেমি'র মতো এবং ওজনে ১.৬ কেজি। মালয় ও ব্রহ্মদেশ হচ্ছে আমের আদিনিবাস।

[চিত্র 1—2]

সারাঙ্গা (গ্লিরিসিডিয়া)

Mother of Cocoa
Madura shade tree
Saranga

Gliricidia sepium (Jacq.) Wall
Fam : Papilionaceae
Flowering period : January-March

মাঝারী আকৃতির গাছ। অসম যৌগিক পাতাগুলি মোটামুটি ডিম্বাকৃতি ও কচি অবস্থায় লোমযুক্ত, শীতকালে— জানুয়ারী মাস নাগাদ প্রায় নিষ্পত্র গাছে ফুল আসে। ফুলের রঙ হালকা গোলাপী, বেগুনী বা লাইল্যাকের মতো। অনেক সময় সব রঙের ফুল একই গাছে দেখা

যায়। ছোট ছোট ফুলগুলি (৬ মিমি'র মতো) লম্বাটে, অনেকটা মটরশুঁটি জাতীয় ফুলের মতো। সমস্ত গাছের ফুল ফুটলে অনেকটা পুষ্পিত সজনে গাছের মতো দেখায়। ফল ছুটি লম্বা শুঁটিযুক্ত।

গাছের পাতা সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, ভারতে এর ব্যবহার শোভাবর্ধক তরু হিসাবে। আদিবাস মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ থেকে উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত। ১৯৫০ সাল নাগাদ পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে সিংহলে গাছটি আনা হয়; এর ১৫ বছর পর সিংহল থেকে বোম্বাই-এ আনা চারা থেকে গাছটি এদেশে জন্মাতে থাকে (সাণ্ডাপাউ, ১৯৬৬)। বৈজ্ঞানিক নাম 'গ্লিরিসিডিয়া'— স্প্যানিশ আমেরিকান ভাষায় 'মাটো-রাঁটো' থেকে অনুবাদ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাটির অর্থ— ইঁদুর নাশক।

মধ্য ও দক্ষিণ অ্যামেরিকায় চাল অথবা ভুট্টার সঙ্গে এই গাছের ছাল গুঁড়ো করে মিশিয়ে ভাল এবং কার্য্যকরী ইঁদুরের বিষ তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতনে শালবীথির কাছে একটি গ্লিরিসিডিয়া গাছ আছে।

পলতে মাদার
(রক্ত মাদার)

Indian Coral tree

Erythrina variegata L.
Fam : Papilionaceae
Flowering period : January-March

ছোট থেকে মাঝারি আকারের গাছ সাধারণতঃ ৭-১০ মিটার লম্বা। তরুণ অবস্থায় বৃক্ষশাখা তীক্ষ্ণ কাঁটায় আবৃত থাকে। একটি লম্বা বৃন্তে বেশ বড় বড় তিনটি করে পাতা। পাতা ডিম্বাকৃতি ও চওড়া। বৃন্তমূলের ছুটি পাতা—অন্য পাতাটির থেকে ছোট। পর্ণমোচী গাছে সম্পূর্ণ নিষ্পত্র অবস্থায় ফুল আসে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে। শাখার শেষ প্রান্তে উজ্জ্বল লাল রঙের ফুল মঞ্জরীতে ফোটে। পাপড়ি পাঁচটি, পরাগকেশর দশটি এবং পুষ্পাবরণের থেকে

আকারে বড়। ফল শুঁটির মতো, সবুজাভ থেকে কালো রঙ। প্রতি শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ১২টির মতো। 'ইরিথ্রিনা' শব্দটি গ্রীক ভাষা উদ্ভূত। ইরিথ্রোজ বা ইরিথ্রিলেজ' এর অর্থ—লাল বা প্রবাল লাল। গাছটির আদিনিবাস ভারতবর্ষ। হিন্দু পুরাণে এই রকম উল্লেখ আছে যে—এই গাছ দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যানে পুষ্পিত হতো। শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গোদ্যান থেকে এই গাছের ফুল চুরি করেন। ত্রিপল্লবযুক্ত পাতাটি হিন্দু ত্রিমূর্তির প্রতীক বলে কথিত। ভারতীয় প্রাচীন খৃষ্টানদের কাছে এই পাতা ঈশ্বরের প্রতীক।

নিম

Margosa

Azadirachta indica A. Juss.
Fam : Meliaceae
Flowering period : April-July

ওষধি হিসাবে এবং বাণিজ্যিক কারণে সমধিক প্রসিদ্ধ নিমগাছ পাতার বিশেষত্ব ও ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে সহজেই চেনা যায়। মাঝারি থেকে বড় আকারের গাছের কাণ্ড সাধারণতঃ ঋজু। চিরহরিৎ এই গাছের পাতা পক্ষল, যৌগিক ও লম্বাটে। প্রত্যেকটি পত্রকের কিনারা খাঁজকাটা মধ্যশিরার দু পাশে পত্রকগুলি পাশাপাশি সাজানো। পাতার রঙ টাটকা ও গাঢ় সবুজ পাতার সমারোহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ফুল ফোটে, পাতার কক্ষে। হলুদ নলের শীর্ষে পাঁচটি সাদা পাপড়ি। ফুলের মধু খেতে মৌমাছি, বিভিন্ন পাখী গাছে এসে ভিড় করে। গোল সবুজ রঙের ফল পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। প্রত্যেকটি ফলে একটি করে বীজ।

নিম কাঠ ব্যবহার আগে শাস্ত্রনিষিদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। নিমপাতা, কীটনাশক ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নিমফল খাদ্য হিসাবে এবং নিম বীজের তেল চর্মরোগ ও কুষ্ঠ নিবারণে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। গাছের ছাল ও আঠা ভেষজ বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

[চিত্র—3]

জ্যাকারাণ্ডা

Jacaranda
Green ebony tree
Fern Tree

Jacaranda mimosifolia D. Don
Fam : Bignoniaceae
Flowering period : April-May

মাঝারি আকৃতির উদ্যানবৃক্ষ। মূল পাতাটি অসংখ্য ছোট ছোট পত্রকে বিভক্ত। লম্বাটে প্রত্যেকটি পত্রক, অন্যটির থেকে আকারে পৃথক। গাছের পুষ্পিত হওয়ার সময়—মার্চ মাস নাগাদ। গাঢ় নীল-বেগুনী রঙের ফুল শাখার প্রান্তে ফোটে। প্রায় ৫ সেমি, লম্বা, ঈষৎ বেঁকানো নলাকৃতি ফুলের শীর্ষে পাঁচটি পাপড়ি—দুটি উপরের দিকে বাঁকানো, তিনটি লম্বা এবং সোজা। চ্যাপ্টা, গোল ফলে অসংখ্য বীজ।

কলম্বিয়ায় জ্যাকারাণ্ডা ভেষজ গুণ সমন্বিত বলে চিহ্নিত। জ্যাকারাণ্ডার আদি নিবাস ব্রাজিল। শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দির ও তালধ্বজ বাড়ীর মাঝে এই গাছ আছে।

[চিত্র 4—5]

অশোক

Asoka tree, Sorrow-less Tree

Saraca indica L.
Fam : Caesalpiniaceae
Flowering period : February-April

মাঝারি আকারের, চির-হরিৎ ও ছাই-বাদামী রঙের ছাল যুক্ত গাছ। গাছের উপরি অংশ ছাতার মতো এবং ঠাসা। গাঢ় সবুজ ও চকচকে বল্লমাকৃতি পাতার কিনারা তরঙ্গায়িত। প্রায় ১৫-২০ সেমি লম্বা পত্রক নিয়ে এক একটি পাতা। প্রত্যেক পাতায় ৪-৬টি পত্রক। নবীন পাতা, নরম ও লালচে। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শাখার প্রান্তে মঞ্জরীতে ফুল আসে। প্রত্যেকটি মঞ্জরী অসংখ্য ছোট লম্বা নলের মতো ফুলে ঠাসা। প্রতেকটি ফুলে চারটি করে

ডিম্বাকৃতি পাপড়ি, নবীন অবস্থায় হলুদ রঙের ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে এবং সূর্যালোকের প্রতিক্রিয়ায় ফুলের রঙ প্রথমে কমলা পরে গাঢ় লালে পরিণত হয়। ফুলের নল থেকে সাদা ও লাল রঙে মেশানো পুংকেশরগুলি বেরিয়ে থাকে। সূর্য্যাস্তের পর ফুল থেকে হাল্‌কা সুগন্ধ বের হয়। লম্বাটে শুঁটিতে ফল আসে। ফলের রঙ লালচে এবং শাঁসযুক্ত।

আয়ুর্বেদিক মতে অশোক গাছ অনেক ভেষজগুণসমন্বিত। ফুল এবং ছালের নির্য্যাস অনেক রোগের প্রতিষেধক। অশোক গাছ হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র বৃক্ষ হিসাবে চিহ্নিত। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও মালয়, অশোক গাছের আদি নিবাস।

[চিত্র 6—7]

সেগুন

Teak,

Tectona grandis L. f.
Fam : Verbenaceae
Flowering period : July-August

বিশাল আকার পর্ণমোচী, পথি-বৃক্ষ। ছাইরঙা বৃক্ষ দেহ। চতুষ্কোণী কচি শাখাগুলি রোমশ। বিরাট পাতা (৩০—৬০ × ১৫—৩০ সেমি) বিপরীতমুখী। চারাগাছের পাতাগুলি আরও বড়। খসখসে পাতাগুলির উপরিপৃষ্ঠ রোমশূন্য। সারা গ্রীষ্মে গাছ পত্রহীন অবস্থায় থাকে, বর্ষায় বড় বড় থোকায় সাদা ফুলে সমস্ত গাছ জমকালো চেহারা ধারণ করে। ছোটখাটো সাদা ফুল, স্থায়ী বৃতিতে ঢাকা। ফুলের সঙ্গে নতুন পাতা জন্মায়। শীতে ফল পাকে। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে যেতে থাকে।

কাঠের জন্য সেগুন প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত সেগুন কাঠ—স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা ও অন্যান্য চরিত্রের জন্য প্রথম শ্রেণীর কাঠ হিসাবে পরিগণিত। মহ[illegible]নাভালার কাছে কার্লা গুহার ছাতে একপ্রস্থ কাঠ ২০০০ বছর অবধি অক্ষত [illegible]সেগুন কাঠের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে রজন জাতীয় জিনিস আছে— এই[illegible]উইপোকার

প্রতিক্রিয়া থেকে কাঠ রক্ষা পায়। ভারত ও ব্রহ্মদেশ থেকে জাভা পর্যন্ত সেগুনের আদি নিবাস। ব্রহ্মদেশ অতি উৎকৃষ্ট সেগুন গাছের আদি নিবাস। বৈজ্ঞানিক নাম— 'টেকটোনা' গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে, অর্থ— ছুতারমিস্ত্রি (টেকটন) 'গ্রানডিস' অর্থ— বৃহৎ।

[চিত্র—৪]

তেঁতুল

Tamarind

Tamarindus indica L.
Fam : Caesalpiniaceae
Flowering period : July-September

বড় আকারের চিরহরিৎ গাছ। যৌগিক পাতা ঘনসন্নিবিষ্ট। ছোট ছোট হলুদ, লাল ফুল থোকায় ফোটে। গ্রীষ্মে ফল আসে। শুঁটি ফল, বাঁকানো ও গড়ন অনিয়মিত। সবুজ ও পরে বাদামী খোলার ভিতরে শাঁসে ঢাকা অনেকগুলি করে বীজ।

আবিসিনিয়া ও মধ্য আফ্রিকার গাছ হিসাবে তেঁতুলকে চিহ্নিত করা হলেও, ভারতে এর আগমন যে অনেক কাল আগে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে তেঁতুল গাছকে অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়। তেঁতুল পাতার অম্লতার এবং ঘন ছায়ার জন্য গাছের তলায় অন্য গাছ বাঁচেনা বলে সম্ভবতঃ এইরকম ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সুদৃশ্য পথি-বৃক্ষ তেঁতুলের কাঠ, ফল, বীজ মানুষের বিভিন্ন ব্যবহারে লাগে। 'ট্যামারিণ্ড' শব্দটি এসেছে ফার্সী 'তামার-ই-হিন্দ' শব্দ থেকে।

রুদ্রপলাশ (স্প্যাথোডিয়া)

Tulip tree
Scarlet bell
Fountain tree

Spathodea campanulata Beauv
Fam : Bignoniaceae
Flowering period : February-May

গত শতাব্দীতে যে সব বিদেশী গাছ ভারতে এসেছে তার মধ্যে স্প্যাথোডিয়া অন্যতম। ঋজু কাণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী ফুলে ছাওয়া এই গাছ পথি-বৃক্ষ হিসাবেই সমধিক জনপ্রিয়।

যৌগিক পাতা, ঘন সবুজ রঙের। প্রতি পাতায় ৪—৮ জোড়া পত্রক ও একটি অন্তিম পত্রক। শীতের শেষে গাছে জলপাই-সবুজ রঙের ও মসৃন ত্বকের কুঁড়ি আসে। থোকার শেষের দিকের কুঁড়ি প্রথমে পুষ্পিত হয়। পুষ্পের দলমণ্ডল ঘণ্টাকৃতি, গোড়ার দিক ঈষৎ হেলানো। ঘণ্টার ওপরের দিক কুঞ্চিত ও মসৃন। ফুলের রঙ উজ্জ্বল লাল, নীচের দিকে হাল্কা কমলা ও হলুদ ছাপযুক্ত। চারটি পরাগকেশর দলমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসে। গর্ভদণ্ডটিও বেশ শক্তিশালী। ফলগুলি লম্বা ও ছুঁচালো। তরুণবীজের ভিতরে জল জমা থাকে, টিপলে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত বীজ কাষ্ঠল।

আফ্রিকার নিজস্ব গাছ, ১৮৭৩ নাগাদ এ্যাঙ্গোলা থেকে শ্রীলঙ্কায় আনা হয়। ভারতে কবে এসেছে সেটা অনুমানের ব্যাপার। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের কিছু পরে ভারতে এর আমদানী হয়। বৈজ্ঞানিক নামের 'স্প্যাথে' অর্থ চামচের মতো পুষ্পাকৃতি আর 'ক্যাম্পানুলেটা' অর্থ— ঘণ্টার মতো।

[চিত্র 9—10]

দেবদারু

Mast tree
Indian far

Polyalthia longifolia Benth. & Hook. f
Fam : Annonaceae
Flowering period : March-April

সুদীর্ঘদেহী, অভিজাত-দর্শন এবং চিরহরিৎ বৃক্ষ। বয়স্ক পাতাগুলি দৃঢ়, আকৃতি বল্লমের মতো, কিনারা তরঙ্গায়িত। তরুণপল্লব উজ্জ্বল হালকা সবুজ। পাতার উপরি পৃষ্ঠ চকচকে। ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সরু ও কোমল বৃন্তে ৫-৬টি ফুল একত্রিত। পাপড়ি সবুজ থেকে

সাদার মধ্যে (২—৩ সেমি × ৬ মিমি)। ফল, প্রথম অবস্থায় সবুজ, লম্বায় ১৮ মিমি, ব্যাস ১২ মিমি। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

ছায়াবৃক্ষ হিসাবেই দেবদারুর ব্যবহার বেশী। মৌসুমী ঝড়ের দাপট সহ্য করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বর্তমানে দেবদারুর একটি বিশেষ শ্রেণী পার্ক-বৃক্ষ হিসাবে সমধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় গাছের শাখা বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে কাণ্ডর সংগে জড়িয়ে থাকে এবং পল্লবিত একটি সুদীর্ঘ থামের আকার ধারণ করে, য়ুরোপের সাইপ্রেসের মতো। হিন্দু-ধর্ম মতে অশোকের পরই দেবদারুর স্থান। হিন্দু উৎসবে দেবদারু পাতার মালা অলঙ্করণের কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল ও সিংহলের আদি গাছ দেবদারুর বৈজ্ঞানিক নাম গ্রীক থেকে নেওয়া হয়েছে, 'পলি' অর্থ— বহু, 'এলাইথালে' অর্থ— নিরাময় করা এবং 'লঙ্গিফোলিয়া' অর্থ— বড় পাতা।

[চিত্র—11]

পেলটোফোরাম

The Rusty Shield

Coper pod

Peltophorum pterocarpum Backer
Fam : Caesalpiniaceae
Flowering period : April-June

ছায়া তরু জাতের, ঘন পল্লবযুক্ত, প্রসারিত সুদীর্ঘ গাছ পর্ণমোচী। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে এর পাতা ঝরে যায়। আবার ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ নতুন পাতা আসে। যৌগিক পাতার (২৫ সেমি.) মধ্যশিরা অবলম্বন করে প্রায় ৫—১৫ জোড়া পত্রক। পুরোন পাতা শক্ত এবং ঘন সবুজ। নতুন পাতা আসার পরই গাছ পুষ্পিত হয় এবং এপ্রিল-মে পর্যন্ত ফুল থাকে। ফুল আসে শাখার প্রান্তে বড় বড় মঞ্জরীতে। কুঁড়িগুলি মরচে রঙের বা জলপাই সবুজ এবং কিছুটা লোমশ। উজ্জ্বল হলুদ রঙের পাপড়ি, পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় ২৫ মিমি., কিনারা ঢেউ খেলানো, পরাগকেশর সংখ্যায় দশ, কমলা হলুদ রঙের। গর্ভমুণ্ড ছোট, গোলাকার,

সাধারণতঃ সবুজ রঙের। ফল হয় শুঁটিতে (৫—১০ × ১৮—২০ সেমি.), পুরাতন তামার মতো বা মরচে-বাদামী রঙ। প্রায় সারা বছরই গাছে শুঁটি থাকে। পুরাতন ফলের রঙ প্রায় কালো।

দক্ষিণ সিংহল ও পূর্বে মালয় হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে এই গাছ জন্মাতে থাকে। বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে এই গাছ ছেয়ে গেছে। শুঁটির রঙের জন্য একে কখনও 'দি কপার পড'ও বলা হয়।

নীলমণি লতা

Purple Wreath

Petrea volubilis L.
Fam : Verbenaceae
Flowering period : January-March

শান্তিনিকেতনের অনেক বাড়ী ছাড়াও আশ্রমে নীলমণি লতা একটা উল্লেখযোগ্য লতা গাছ। ট্রপিক্যাল অ্যামেরিকা থেকে এই লতানো গাছ অনেক বছর আগে ভারতবর্ষে এসেছে। শান্তিনিকেতনে নীলমণি লতা এসেছে ডাঃ উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ার্সনের সৌজন্যে।

> "শান্তিনিকেতন-উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়ীতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়ার্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপন করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীল ফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করল। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বানী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছা হত, কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলেনা। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণি লতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয়নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সেদিন রূপের স্মৃতি নামের দাবী করল।"
>
> (বনবানী : পৃ : ২৪)

ধূসর ছাল সমেত ফাটল লতা। মাঝে মাঝে ছেঁটে না রাখলে দ্রুত বেড়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বছরের শেষে অল্প সময়ের জন্য গাছে একবার ফুল এলেও প্রধান ফুল ফোটার সময় হল— বসন্তকাল (ফেব্রুয়ারী-মার্চ)। সারা গাছ জুড়ে হালকা নীল-বেগুনী ফুলের ঝর্ণা নামে।

তারাকৃতি ফুলের রঙ ধারের দিকে বেশী গাঢ়। ছোট বৃন্তের ওপর জোড়ায় জোড়ায় ফুল একসঙ্গে একটা ঝাড়ের আকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে ফুল হিসাবে দূর থেকে আমরা যেটাকে দেখি সেটি হচ্ছে ফুলের বৃতি। বৃতির পাঁচটী দলমণ্ডলযুক্ত ফুল। ফুলের কেন্দ্রে সাদা রঙের ছিটে থাকে। ফুল ঝরে গেলে বৃতিগুলি থেকে যায়। পাতার কক্ষ থেকে ঝর্ণার মতো নেমে আসা ফুলের ঝাড়ের নীচের দিকে ফুল দেখা যায়। ওপরের দিকে কেবল বৃতি। বৃতিগুলি শুকিয়ে গেলে হাওয়ায় উড়ে যায়। ভারতবর্ষে এগাছে ফল দেখা যায় না।

ডিম্বাকৃতি পাতা প্রায় ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা। পাতার শিরাবিন্যাস বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। শক্ত ও খসখসে পাতার রঙ উপরের তুলনায় নীচের দিকে গাঢ়তর। নতুন পাতার রঙ উজ্জ্বল হলেও অন্যান্য গাছের কচিপাতার মতো নরম নয়।

ফুলের ঝাড় কানা উঁচু ছড়ানো পাত্রে জল দিয়ে রেখে দিলে বেশ কয়েকদিন থেকে যায়। লতার কোন অংশ কেটে পুঁতলে নতুন গাছ জন্মায়। তবে কলম করে নিলে অথবা সাকার (Sucker) কেটে গাছ করাই ভাল।

১৮ শতাব্দীর লর্ড পেত্রে Exotic উদ্ভিদের বিরাট সংগ্রহ গড়ে তোলেন। লতাটির বৈজ্ঞানিক নাম লর্ড পেত্রে'র স্মৃতি বহন করছে। (Volubilis অর্থ twining to coil round)।

শান্তিনিকেতনে উদয়ন ও কোনার্ক বাড়ীর মাঝখানে, উদয়ন বাড়ীর পাশের বাগানে ঢোকার দরজার কাছে একটি ও বিদ্যাভবন অফিসের সামনে একটি করে নীলমণি লতা আছে।

[চিত্র 12—13]

গুলমোহর (রাধাচূড়া)

Gulmohor
Flamboyant

Delonix regia Ref.
Fam : Caesalpiniaceae
Flowering period : April-July

গ্রীষ্মের অন্যতম ফুল— গুলমোহর। রাস্তার দু-ধারে ছায়াতরু জাতীয় এই গাছ উজ্জ্বল লাল ফুলে ভরে থাকে ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাঝারি সাইজের গাছ ১০—১৫ মিটার লম্বা। গুলমোহর খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পাতার আকার ধারণ করে।

প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া যৌগিক পাতা হাল্কা সবুজ রঙের। প্রতি মধ্য-শিরার সঙ্গে যুক্ত ১০-২০ জোড়া উপশিরা ২০-৩০ জোড়া উপপত্রর সঙ্গে যুক্ত। ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাস অথবা আরও একটু পরে, গাছের সব পাতা ঝরে যায়। গাছে ফুল আসে এপ্রিল-মে মাসে, শাখার শেষ প্রান্তে ঝাড়ের মতো গোছায় ফুলগুলি সুবিন্যস্ত থাকে। প্রতিটি ফুলে চারটি করে উজ্জ্বল লাল রঙের পাপড়ি এবং পঞ্চমটি লালে-হলুদে মেশানো ও আকারে ঈষৎ বড়। পাপড়িগুলি চামচের মতো ও ধারের দিকে ঢেউ খেলানো। তলার দিকে সরু ও লম্বা— অনেকটা নখের মতো। ফুল ফোটার আগে একটি আবরণ দলমণ্ডলকে ঢেকে রাখে। বৃতি— সবুজ রঙের। ফুল ফোটার পর বৃতির ভিতরের রঙ উজ্জ্বল লাল। বিভিন্ন আকারের দশটা করে পরাগকেশর। ফল— বৃহদাকার, শুঁটী জাতীয়— প্রথমে সবুজ ও নরম, পরিণত হলে গাঢ় বাদামী ও খুব শক্ত ; আকারে প্রায় ৪০-৫০ সেমি লম্বা ও ৫-৮ সেমি চওড়া। কাঠ হাল্কা ও সাদা।

গুলমোহর— এই নামটির উৎস সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। হিন্দীতে 'গুল' অর্থ গোলাপ বা ফুল। 'মোহর' অর্থে— মুদ্রা। কেউ কেউ মনে করেন মোহর শব্দটি 'মোর' শব্দের অপভ্রংশ ; 'মোর' অর্থ ময়ূর। ফরাসী ভাষায় এগাছের নাম Flour de Paradis, ইংরাজীতে Flamboyant, Royal Gold Mohur, Royal Peacock Flower, Fire tree. বৈজ্ঞানিক নাম ***Delonix regia*** ডেলোনিক্স, কথার অর্থ— "পরিষ্কার তীক্ষ্ণ নখর সহ"। রিজিয়া অর্থে— রাজকীয়।

গুলমোহর প্রকৃতপক্ষে মাদাগাস্কারের গাছ। ১৮২৪ সালে এই গাছ মরিশাসে আসে, পরে ইংল্যাণ্ড থেকে সমস্ত উষ্ণ (Tropical) অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে অনেক গুলমোহর গাছের মধ্যে চীনভবনের সামনের গাছটি উল্লেখযোগ্য।

[চিত্র 14—15]

কদম

Anthocephalus indicus A. Rich
Kadamba
Fam : Rubiaceae
Flowering period : July-September

কদম ভারতবর্ষের নিজস্ব গাছ। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে বর্তমান কালের রবীন্দ্রসাহিত্যে এই গাছের রূপাভাস বার বার স্থান পেয়েছে।

১৯-২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা গাছ। কালচে ধূসর ছালে লম্বা ফাটল ধরে। বাইরের দিকে ছাল চৌকো অংশে ভেঙে যায়। ডিম্বাকৃতি, ঘন সবুজ পাতা তরুণ অবস্থায় রোমশ ও গোলাপী অথবা লাল ছোপযুক্ত। পাতায় শিরাবিন্যাস স্পষ্ট। শাখার দু পাশে পাতাগুলি জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে আসে। কচি কিশলয় ও অঙ্কুর ঘিরে এক জোড়া উপাঙ্গ এদের রক্ষা করে। উপাঙ্গটি খসে গেলে দুটি স্পষ্ট দাগ রেখে যায়।

একক ভাবে ফুলগুলি ছোট বলে চোখে পড়ে না কিন্তু সমস্ত ফুল একত্রে যে গোলকটি তৈরী করে সেটা সহজেই চোখে পড়ে। গোলাকৃতি এই পুষ্পমঞ্জরীর একক ফুলগুলি লালচে হলুদ রঙের। ফুলের গর্ভকেশর পরিণত হলে গোলকের চারপাশে একটি হালকা মণ্ডলের সৃষ্টি করে। ফুল ঝরে গেলে, ছোট প্রায় শক্ত গোলাকার ফল বেরিয়ে আসে। পাকলে, ফলের রঙ কালো বা কালোর কাছাকাছি। স্থানীয় অনেকে কাঁচা অথবা পাকা কদম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।

ফেব্রুয়ারী মাসে পাতা ঝরে যায়। জুন থেকে গাছে ফুল আসতে থাকে এবং জুন থেকে আগষ্ট অর্থাৎ বর্ষায় গোটা গাছ ফুলে ভরে থাকে। শান্তিনিকেতনে পুষ্পিত গাছে সবুজ পাতার সমারোহ দেখা যায়।

আশ্রমে দিনান্তিকার পাশে ও পুরোন মেলার মাঠের পূর্ব দিকের কদম গাছ সহজে চোখে পড়ে।

[চিত্র 16—17]

ছাতিম

Alstonia scholaris R. Br.
Fam : Apocynaceae
Flowering period : October-February

Devil's tree
Deta Book tree

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই চিরসবুজ গাছটি দেখতে পাওয়া যায়। জাভা ও অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলেও এদের দেখা যায়। শান্তিনিকেতনের সামাজিক জীবনে ছাতিমের স্থান বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত।

দীর্ঘদেহী, শক্তসমর্থ গাছ, খসখসে ও ঈষৎ ধূসর। ছায়াতরুর মতো, শাখা প্রশাখা চারপাশে খুব একটা প্রসারিত নয় বরং একটু আঁটসাট। পাতাগুলি শাখার চারপাশ থেকে চক্রাকারে বেরিয়েছে। পাতার সংখ্যা ৬ থেকে ১০, (সংস্কৃত নাম—সপ্তপর্ণী অবশ্য পাতার সংখ্যা ৭, হিসাবে চিহ্নিত করছে) চক্‌চকে, ডগার দিকে ভোঁতা ও গোড়ার দিক ক্রমশ সরু, পাতার ওপরের দিক ঘন সবুজ এবং নীচের দিক সাদাটে আভাযুক্ত। হেমন্তে ছাতিম ফুল ফোটে। ছাতিমফুল তীব্র ও সুগন্ধী। অনেক দূর থেকে এর বিশিষ্ট গন্ধ চেনা যায়। শাখার প্রান্তে লিক্‌লিকে ডাঁটায় সাদা অথবা সবুজ অথবা সবুজ আভাযুক্ত ছোট ছোট থোকায় ফুলগুলি ফুটে থাকে। পুষ্পিত ছাতিম গাছ জড়োয়া গহনার মতোই জমকালো। ফল, ৩০-৫০ সেমি লম্বা এবং সরু। জোড়ায় জোড়ায় ফুলগুলি যখন ঝুলে থাকে তখন গাছের সার্বিক চেহারাই পাল্টে যায়। ফুলগুলি শুকিয়ে গেলে ফেটে বীজগুলি বেবিয়ে আসে। তুলোর মতো একটি অংশকে অবলম্বন করে বীজ বাতাসে অনেকদূর পর্যন্ত ভেসে যায়।

এর জাতিগত নাম এডিনবরার বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদ প্রফেসর মিঃ এ্যালষ্টনের স্মৃতি বহন করছে। অতীতে ছাতিম গাছের কাঠ থেকে লিখবার স্লেট তৈরী হতো। এই সূত্রে 'স্কলারিস্'

শব্দটি ছাতিমের বৈজ্ঞানিক নামের সংগে যুক্ত হয়েছে। গাছের সংগে কোন অশুভ শক্তি জড়িত--এমন সাধারণ বিশ্বাস থেকে এই গাছের ইংরাজী নাম হয়েছে ডেভিলস্ ট্রি। মারাঠী ভাষায় এই গাছের নাম—সাত্তিন বা শয়তান। পশ্চিমঘাটের উপজাতীয় লোকেরা ছাতিম তলায় বসতে চায় না; তাদের বিশ্বাস, এই গাছের তলায় বসার অর্থ--মৃত্যু। ছাতিম ফুল, অনেকের মতে বিভিন্ন জাতীয় এ্যালার্জী রোগ সৃষ্টি করতে পারে। শান্তিনিকেতনে অবশ্য সপ্তপর্ণী তথা ছাতিমের নাম সম্মানের সংগে উচ্চারিত এবং শুভ প্রতীক হিসাবে শ্রদ্ধেয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখানকার একটি ছাতিম গাছের তলায় এসে বসেন এবং দিব্যভাবনায় মগ্ন হন। এই সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সংগে বোলপুরের এই উষর প্রান্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বর্তমান বিশ্বভারতী এবং এর সংগে যুক্ত বিচিত্র কর্মকাণ্ড উল্লেখিত যোগাযোগের ফলশ্রুতি। সমাবর্তনে স্নাতকদের নিদর্শনপত্র হিসাবে একটি করে সপ্তপর্ণী পল্লব দেওয়াই বিশ্বভারতীর প্রথা।

[চিত্র 18—19]

কাঞ্চন

Purple Bauhinia
Mountain ebony

Bauhinia variegata L.
Fam : Caesalpiniaceae
Flowering period : February-April

বেগুনী রঙের কাঞ্চন ফুল শান্তিনিকেতনের খুব পরিচিত গাছ। মাঝারি আকৃতির প্রায় চির সবুজ গাছ। ঘন বাদামী মসৃণ ছাল। কাঞ্চনের পাতা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ— প্রায় ১০-১৪ সেমি. লম্বাটে, গোলাকার পাতা, ডগার কাছে দুইভাগে বিভক্ত। দুটি পাতা একসঙ্গে মাঝামাঝি জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। পাতার ডগা এবং গোড়া গোলাকার। বেগুনী রঙের সুগন্ধি ফুল ফোটে শাখার প্রান্তে। দুটি অংশে বিভক্ত পুষ্প আবরণী ৫টি করে পাপড়ি ধরে রাখে। প্রতিটি পাপড়ি ৪-৫ সেমি. লম্বা। পাঁচটি পরাগকেশরের মধ্যে দুটি বন্ধ্যা। যদিও "ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল", কিন্তু শান্তিনিকেতনে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসেও কাঞ্চন

গাছে ফুল দেখা যায়। শুঁটি জাতীয় চ্যাপ্টা ফল, ১৫-২৫ সেমি. লম্বা। পাতার ফাঁকে লুকিয়ে থাকা ফলগুলি নিষ্পত্র গাছে স্পষ্ট দেখা যায়। ফল পেকে গেলে সশব্দে ফেটে যায় এবং বীজগুলি ছড়িয়ে যায়। কাঞ্চন গাছের মূল বিষাক্ত।

গোলাপী অথবা শ্বেত কাঞ্চন গাছের সঙ্গে বেগুনী কাঞ্চন গাছের মিল খুবই বেশী। এক্ষেত্রে পাতাগুলি একটু বেশী চওড়া। চেরা অংশটির গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। পর্ণমোচী, গাছের পাতা ঝরতে থাকে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। মার্চ মাস থেকে প্রায় নিষ্পত্র শাখাগুলি ফুলে ভরে যায়।

[চিত্র 20—21]

সুলতান চম্পা

সুলতান চাঁপা, কাঠচাঁপা
পুন্নাগ, কাঠজুঁই (পা.)
Alexandrian Lanrel.

Calophyllum inophyllum L.
Fam : Clusiaceae
Flowering period : July-September

মসৃণ কালো বন্ধনের গাছ। ডিম্বাকৃতি, মসৃণ ও চক্চকে পাতায় মধ্যশিরা স্পষ্ট, সমান্তরাল পার্শ্বশিরাগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট। চারটি সাদা দলযুক্ত সুগন্ধি ফুল। ফুলের কেন্দ্রে অসংখ্য হলুদ রঙের কেশর কয়েকটি গুচ্ছে আবদ্ধ। পুরুষ পুষ্প ও উভলিঙ্গ পুষ্প একই গাছে দেখা যায়। উভলিঙ্গ গাছে গর্ভাশয় আছে— উজ্জ্বল সোনালী রঙের ও গোলাকৃতি। পুষ্পদল ঝরে গেলে বৃন্তের উপর গর্ভাশয়টি স্পষ্ট দেখা যায়। ফুল ফোটার সময়— জুলাই-সেপ্টেম্বর মাস অথবা কখনো নভেম্বর। গোলাকৃতি ফল, হরিদ্রাভ-সবুজ রঙের এবং মসৃণ ত্বকযুক্ত।

জাতিগত নাম— ক্যালোফিলাম, অর্থ— 'সুচারু পত্র', প্রজাতিগত নাম— ইনেফিলাম, অর্থ— 'দৃঢ় শিরাপত্র'। ভারতীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে, পূর্ব আফ্রিকা থেকে তাহিতি পর্যন্ত এদের বাস। শান্তিনিকেতনে, উত্তরায়ণের সামনে আশ্রমে ঢোকার গেটের বাঁপাশে জলের কলের কাছে একটি সুলতান চম্পা গাছ আছে।

পলাশ

Parrot tree
Flame of the Forest

Butea monosperma Taub.
Fam : Papilionaceae
Flowering period : February-April

মাঝারি আকারের ধূসর অথবা বাদামী গাছ। পাতা ঝরা গাছ। কাণ্ড ও শাখা ঈষৎ বক্র। মার্চ-এপ্রিল মাসে, প্রত্যেকটি বৃন্তে তিনটি করে পাতা গজায়। পাতাগুলি গোড়ার দিকে ভোঁতা ও গোলাকৃতি। নবীন পাতা— রেশমের মতো মসৃণ হালকা সবুজ, বয়স্ক পাতা— শক্ত গাঢ় সবুজ। শীতকালে, (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) সব পাতা ঝরে যায়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে পত্রশূন্য গাছে, গাঢ় বাদামী অথবা জলপাই সবুজ রঙের ভেলভেটের মতো মসৃন, রোমশ ছালে ঢাকা শাখায় ফুলের সমারোহ। কালো বাদামী অথবা জলপাই সবুজ রঙের বৃতি, পাঁচটি করে দলমণ্ডল ধরে রাখে। দলমণ্ডলের রঙ উজ্জ্বল লাল অথবা কমলা (কোন কোন ক্ষেত্রে হলুদ)। উজ্জ্বল বর্ণের ফুল, নিষ্পত্র গাছে রঙের আগুন জ্বেলে দেয়। ফল – চ্যাপ্টা শুঁটির মতো, ১২-১৮ সেমি. লম্বা ডগার দিকে সরু হয়ে আসা, সেখানে একটি কেবল বীজদানা। তরুণ শুঁটিগুলি রোমশ ভেলভেটের মতো।

ফুলের মধু ইত্যাদি প্রজাপতি অথবা মৌমাছি ছাড়া ছাতারে, ময়না, মৌটুসী, টিয়া ইত্যাদি পাখীকে আকৃষ্ট করে। পলাশ গাছ যে বিচিত্র সব পোকাদের আবাসস্থল তাদের মধ্যে লাক্ষাকীট উল্লেখযোগ্য।

ভারত, ব্রহ্মদেশে সর্বত্র দেখা যায়। জাতিগত নাম, বিউটের, তৃতীয় আর্ল জন ষ্টুয়ার্টের সম্মানার্থে উদ্ভাবিত। মনোস্পারমা— এই সুনির্দিষ্ট নামটির অর্থ একবীজযুক্ত। চন্দ্র ও ব্রহ্মার পূজায় পলাশ ফুল প্রয়োজন। ত্রি-শীর্ষ ফুল হিন্দুধর্মের আদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতীক। শান্তিনিকেতনে পলাশ, বসন্তের দূত। বসন্তোৎসবে পলাশ একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাচার। আশ্রমের বিভিন্ন জায়গায় পলাশ গাছ ছড়িয়ে আছে। অন্য সময় এদের চোখে না পড়লেও, বসন্তকালে নিজেদের অনায়াসে প্রকাশ করে।

[চিত্র 22—24]

শিমূল

Red Silk Cotton

Bombax ceiba L
Fam : Bombacaceae
Flowering period : January-February

সুদীর্ঘ বড় বড় শাখাযুক্ত পাতাঝরা বিশাল গাছ। উচ্চতায় ২৫ মিটার পর্যন্ত। ঋজু, ছাই রঙের কাণ্ডকে দৃঢ়তা দেওয়ার জন্য, আশ থেকে শিকড়ের অংশগুলি দেওয়াল তৈরী করে। প্রধান কাণ্ডকে ঘিরে সমান্তরাল তুটি অথবা তিনটি শাখা চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। তরুণ কাণ্ডের গায়ে কোণাকৃতি কাঁটা গাছকে মানুষ ও জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা করে।

যৌগিক পত্র। প্রতি পাতায় ৫-৭টি বল্লমাকৃতি বড় এবং উজ্জ্বল সবুজ রঙের পল্লব। বছরের বেশীর ভাগ সময়েই গাছে পাতা থাকে। জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে সমস্ত পাতা ঝরে যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে নিষ্পত্র ডালগুলিতে শক্ত ভারী বেগুনী-গোলাপী রঙের কুঁড়ি দেখা যায়। অল্পদিনের মধ্যে প্রতি কুঁড়ি থেকে ছোট ও মোটা বৃন্তের উপর বাটীর মতো বৃতিতে আবদ্ধ ফুল ফুটে ওঠে। পুষ্পদলগুলি পুরু ১২ সেমি. অথবা তার চেয়ে লম্বা, ২-৩ সেমি. চওড়া, বাইরের দিকে মসৃণ, ভেতরটা রেশমের মতো। দলের রঙ উজ্জ্বল লাল। ৬০'এর অধিক পুংকেশর ফুলের মধ্যে বৃত্তাকারে সজ্জিত। এগুলির গোড়া হলুদ, ডগার দিকে হালকা লাল ও একটি করে কালো রেণুগুলি ধরে থাকে। লাল ছাড়া পুষ্পদলের রঙ হলুদ, কমলা, গোলাপী অথবা সাদাও হয়। বিশাল গাছে অসংখ্য ফুলের সমারোহ, অজস্র পাখী, বিশেষ করে গাঙ শালিক, জঙ্গল ময়না, মৌটুসী, বুলবুলি, কাক, চড়াই ইত্যাদি এসে ভিড় করে। তাজা ফুল খসে মাটিতে পড়লে গবাদি পশু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মার্চ-এপ্রিল মাসে ১০-১৫ সেমি. লম্বা, ৩-৫ সেমি. চওড়া, লম্বাটে ও সুদৃঢ় কাষ্ঠল ফল পেকে ওঠে। ফল ফেটে সাদা তুলোর মতো ভর করে ছোট ছোট কালো বা বাদামী বীজ হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

শিমূল ভারতবর্ষ ছাড়া, বর্মা, শ্রীলঙ্কা, মালয় অঞ্চলেও জন্মায়। জাতিগত নাম Salmolia—শিমূলের সংস্কৃত নাম 'শালমলী' থেকে জাত। বিশ্বসৃষ্টির পর পিতামহ ব্রহ্মা শাল্মলী গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে দিনান্তিকা ও ছাত্রসঞ্চালনের দপ্তরের কাছে একটি এবং ছাতিম তলার পশ্চিমে পুরোন প্রেসবাড়ীর কাছে একটি বিরাট শিমূল গাছ আছে।

[চিত্র—25]

কাঁঠাল

Jack fruit

Artocarpus heterophylla L.
Fam : Moraceae
Flowering period : January-April

মাঝারি থেকে বড় চেহারার চিরসবুজ গাছ। শীতকালে কিছু পাতা ঝরে পড়লেও, গাছ কখনই পত্র বিরল নয়। শাখার আগার পাতাগুলি ঘনগুচ্ছে সজ্জিত। আকৃতিগতভাবে পাতাগুলি লম্বাটে—গোল, মাথার দিকে ভোঁতা ও গোড়ার দিকে ছুঁচালো। পাতার পূর্বদেশ মসৃণ ও চকচকে ও তলার দিক খসখসে ও ফিকে রঙের। ফুল ফোটে শাখার আগায়, শাখা অথবা কাণ্ডের গায়ে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথক, কিন্তু একই গাছে ফোটে। নলাকৃতি দল-মণ্ডলযুক্ত অসংখ্য ছোট ছোট ফুলগুলি (১-৮ সেমি) দুটি সবুজ পুষ্পপত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। শাখার আগায় ঘন পত্র সজ্জার মধ্যে পুরুষ ফুলের কুঁড়িগুলি সহজে দেখাই যায় না। স্ত্রী ফুল শাখা ও কাণ্ডের গায়ে গুচ্ছিত অবস্থায় দেখা যায়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ফুল ফোটে। কাঁঠালগুলি মোটামুটিভাবে লম্বাটে গোল অথবা অন্য কোন বিচিত্র আকৃতির ও বিভিন্ন ওজনের হতে পারে। ফলের সারাদেহ অসংখ্য ছোট ছোট কোণাকৃতি কাঁটার মতো অংশে ঢাকা। কাঁঠাল যৌগিক ফল তরুণ অবস্থায় অর্থাৎ এঁচোড় অবস্থায় সবুজ এবং পাকলে হলুদ বাদামী রঙ নেয়। ফলের ভিতরে প্রতিটি কক্ষে একটি করে বীজ ও বীজকে ঘিরে নরম ও মাংসল খাদ্যাংশ।

ভারতবর্ষে কাঁঠালগাছ সুপ্রাচীন কাল থেকে খুব পরিচিত গাছ। পূজা-পার্বণে কাঁঠাল গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বছর আগে গ্রীক ঐতিহাসিক থিওফ্রেটাস লিখে গেছেন, "খুব বড় আকারের আরও একটি গাছ আছে যার ফল আশ্চর্য্য রকমের মিষ্টি ও বিরাট, ভারতের মুনি-ঋষিরা এই ফল খেয়ে থাকেন……"।

ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাটের বর্ষাপ্রধান বনাঞ্চল এই গাছের আদি নিবাস—এমন অনেকে মনে করেন। ভারত ছাড়া ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কায়ও কাঁঠাল গাছ পাওয়া যায়। গ্রীক শব্দ Artocarpus-এর অর্থ 'রুটি ফল'।

(Gk. arts-bread ; Gk. Karpos—ফল)

[চিত্র—26]

শিশু

Bombay Rose Wood
Bombay Black Wood
Sisso

Dalbergia sissoo Roxb.
Fam : Papilionaceae
Flowering period : January-March.

মাঝারি থেকে বড় ধরনের গাছ। বয়স্ক গাছের মূল গুঁড়িকে কেন্দ্র করে তার শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। সাধারণতঃ ১৫-৩০ মিটার লম্বা। গাছের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা থেকে উৎকৃষ্ট কাঠ পাওয়া যায়। ধূসর রঙের বাকলে গাছের কাণ্ড আবৃত। মোটা-মুটি চক্রাকারে ৫-৭টি পাতা একটি মূল বৃন্তের দু'পাশে একটার পর একটা সাজানো থাকে। শীতের শেষে পাতা ঝরে যায়। পাউডার পাফের মতো ফুলের কেন্দ্রের রঙ সবুজাভ বাইরের দিকের রঙ সাদা। সরু ফালির মতো ফল, শুঁটি জাতীয়। শুঁটির মধ্যে ৩-৪টি করে ফল। শান্তিনিকেতনে মার্চ মাস নাগাদ এবং বর্ষায় এমনকি শরতেও ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফুল গুলি শুকিয়ে অনেকদিন গাছে ঝুলে থাকে। শুকনো ফল বাতাসে দুলে শব্দ সৃষ্টি করে। গাছে নবীন ও শুকনো ফল কখনও কখনও একই সংগে দেখা যায়।

বটগাছ

Banyan tree

Ficus benghalensis L.
Fam : Moraceae
Flowering period : December-February

সমগ্র ভারতবর্ষে বটগাছ একটি অন্যতম ছায়াতরু। বটচ্ছায়া গ্রাম্য সামাজিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ৭০ থেকে ১৫০ ফিট লম্বা গাছ, চারপাশে বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। শাখামূল তন্তুর আকারে বেরিয়ে এসে ক্রমশঃ মাটিতে গেঁথে যায় এবং সময়ের ব্যবধান শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হয়ে ভারী শাখাগুলিকে ঠেকা দিয়ে রাখে। ডিম্বাকৃতি পাতাগুলি চক্‌চকে, মজবুত ও নিটোল। পত্রমুকুল এক জোড়া আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। নতুন পাতা আকর্ষক লাল রঙের। গাছে ফুল, ডুমুরের মতো একটি পুরু রসালো থলির মধ্যে থাকে। থলিগুলি জোড়ায় জোড়ায় কোন বৃন্ত ছাড়াই পত্রকক্ষে আটকানো থাকে। উভয় লিঙ্গের অসংখ্য ছোট ছোট ফুলে থলি পূর্ণ। ফলের ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র পোকার বাস। পরাগ সংযোগের ব্যাপারে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে ফলগুলি পেকে উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারন করে। পাকা বটফল কাক, শালিক, ময়না, টিয়া ইত্যাদি পাখীর এবং বাদুড়, কাঠবিড়ালীর খাদ্য।

পাখী অথবা অন্য কোনভাবে বাহিত বটের বীজ বাড়ীর দেওয়ালের ফাঁক, তালগাছের কোটর ইত্যাদি অদ্ভুত জায়গায় অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। শিবপুরে প্রায় ৪০০ বর্গমিটার অঞ্চল জুড়ে যে বিশাল বটগাছ আছে, সেটি ১৭৮২ সালে তালগাছের ওপর পতিত একটি বীজ থেকে জন্মিয়েছে।

বটগাছ ধর্মীয় কারণে কাটা নিষিদ্ধ। প্রাচীনকালে গাছের ছায়ায় ব্যবসায়ীদের আড্ডা বসতো। ইংরাজী নাম এই সূত্রে এসেছে।

[চিত্র 27—29]

অশ্বত্থ

Peepal
Bo tree

Ficus religiosa L.
Fam : Moraceae
Flowering period : March-October

আমাদের দেশে ডুমুর জাতীয় গাছের মধ্যে অশ্বত্থ অন্যতম। বটগাছের মতো কোন শুণ্ডমূল এ গাছে নেই। কচি শাখা, পাতা মসৃণ ও কমবেশী চকচকে ; পাতা চামড়ার মতো, ডিম্বাকৃতি, পত্রশীর্ষ হঠাৎ সরু হয়ে গেছে। মূলদেশ গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকার। লম্বা পত্রবৃন্ত। পাতায় মজবুত শিরা, পাতার প্রান্তে একটি ঢেউ খেলানো রেখা তৈরী করেছে। মাথা নীচু করে ঝুলে থাকা পাতাগুলি অল্প হাওয়ায় তির তির করে এপাশে ও ওপাশে দুলতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে অশ্বত্থ গাছের শীতল ছায়া একটি লোভনীয় প্রস্তাব। এপ্রিল মাস নাগাদ উজ্জ্বল লাল রঙের নতুন পাতা গজায়। পত্রবৃন্ত ও শাখার সন্ধিস্থলে জোড়ায় জোড়ায় ডুমুর জাতীয় ফল গজায়। প্রথমে এইগুলি সবুজ ও মসৃণ থাকে, পাকলে শেষ পর্যন্ত বেগুনী হয়ে ওঠে। পাকা ফল বিভিন্ন পাখী ও অন্যান্য প্রাণীর প্রিয় খাদ্য। বট ফলের মতো পাখীরা এই বীজ হজম না করতে পেরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। যে সব জায়গায় যথেষ্ট আর্দ্রতা আছে সেখানে অসম্ভব সব জায়গায় এরা অঙ্কুরিত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির গাছকে আশ্রয় করে অশ্বত্থ গাছ জন্মাতে দেখা গেলেও এরা বা বট পরজীবি নয়।

কথিত আছে অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে ভগবান বুদ্ধ তপস্যারত ছিলেন। বুদ্ধগয়ার অশ্বত্থ গাছ তথা বোধিবৃক্ষ ধর্মীয় তাৎপর্য্য পূর্ণ (এই সূত্রে অশ্বত্থর ইংরাজী নাম Bo tree)। হিন্দুমতে অশ্বত্থ গাছ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মহিমাযুক্ত। খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৮ সালে উত্তর ভারত থেকে একটি অশ্বত্থ গাছ শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই রোপণ করা হয়। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গাছটি বেঁচে ছিল।

সোঁদাল

অমলতাস
বাঁদরলাঠি Indian Laburnum
স্বর্ণদল Golden shower (Diteh)

Cassia fistula L.
Fam : Caesalpiniaceae
Flowering period : June-August

ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির পাতাপড়া গাছ (৬-১৫ মিটার লম্বা)। খাটো গুঁড়ি, ধূসর সবুজ বাকল। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস, গাছের বিবর্ণ পাতা ঝরে পড়তে থাকে। অনেক

গাছ নিষ্পত্রও হয়ে পড়ে। গোলাপী থেকে তামাটে রঙের নবীন পাতার বয়স হলে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ ধারণ করে। যৌগিক পাতা ৪-৮ জোড়া ডিম্বাকৃতি পল্লব, একটি মধ্যশিরার দু'পাশে সমান সংখ্যায় সজ্জিত। মে মাস নাগাদ নিষ্পত্র গাছে লম্বা ও আগত ঝাড়ে ফুলের আবির্ভাব হয়। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের অসংখ্য ফুল ঝাড় লণ্ঠনের মতো ফুটে থাকে। প্রতিটি ঝাড় প্রায় ১ ফুট লম্বা। এককভাবে প্রতিটি ফুলের সবুজ বৃতি পাঁচটি পাত্রের আকৃতি অসম ফুলকে ধরে রাখে। দলমণ্ডলের কেন্দ্রে ১০টি পরাগকেশরের মধ্যে ৩টি লম্বা, ৩টি ছোট ও অপর ৪টি মাঝারি আকৃতির। ফুলের ঔজ্জ্বল্য ও আকৃতির বৈচিত্র্য অনেক সময় দেখা যায়।

পুষ্পবিকাশের আগে প্রায় নিষ্পত্র গাছে অসংখ্য ফুল অদ্ভুতভাবে ঝুলে থাকে। ৫০-৬০ সেমি লম্বা পাইপের মতো মসৃণ গোল ফলগুলি কচি অবস্থায় সবুজ ও নরম থাকে। ফল পেকে গেলে এগুলি গাঢ় বাদামী থেকে কালো রঙের দণ্ড হিসাবে ঝুলে থাকে। সমস্ত ফল কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, প্রতি প্রকোষ্ঠে একটি করে বীজ। বীজের পাশে মিষ্ট শাঁস বিভিন্ন পোকা ও বাঁদরদের আমন্ত্রণ করে। লক্ষ্য করা গেছে যে সব অঞ্চলে বাঁদরদের উপদ্রব বেশী সেইসব অঞ্চলে সোঁদাল গাছও বেশী। বাঁদরেরা কচি ফল খেয়ে বীজ ফেলে দিলে নতুন গাছ জন্মায় পক্ষান্তরে অন্য ফলগুলি পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রজাতির নাম Fistula, অর্থ— চোঙা। সংস্কৃত নাম স্বর্ণফলের অপভ্রংশ— সোঁদাল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে সোঁদাল গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও মনে করা হয় ভারতবর্ষই গাছটির আদি আবাসস্থল।

জারুল

Queen flower
Crape flower

Legerstroemia speciosa Pers
Fam : Lythraceae
Flowering period : June-August

বর্তমানে সাধারণতঃ শোভাবর্ধক এবং ছায়াতরু হিসাবে এই গাছ লাগানো হচ্ছে। মলিন রঙের খাড়া কাণ্ডের গাছ, ৫-৭ মিটার লম্বা হয়। পাতা সরল, বৃহদাকার (১০—১৪ ×

৬—৮ সেমি), আকার অনেকটা আম্রপল্লবের মতো। পর্ণমোচী গাছ। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সব পাতা ঝরে যায়, সে সময় পাতার রঙ লালচে বা হলদেটে হয়ে আসে। মে মাস নাগাদ তরুণ পুষ্পপুঞ্জের সঙ্গে নতুন পাতার আবির্ভাব ঘটে। লম্বা লম্বা থোকায় বা মঞ্জরীতে ফুল আসে শাখার একদম শেষপ্রান্তে। ফুলের রঙ বেগুনী থেকে ফিকে লাল। মঞ্জরীর গোড়ার ফুল আগে ফোটে, আগার ফুল শেষে। যখন আগার ফুল ফোটে তখন গোড়ার ফুলের রঙ মলিন হয়ে আসে। সবুজাভ বৃতি, মজুবত পেয়ালার আকৃতি। ফুলের মাঝখানে পুংকেশর অনেকগুলি, রঙ লালচে বা হলদেটে, দলমণ্ডলের চাইতে ছোট। ফুলগুলি ছোট (২-৩ সেমি) কমবেশী গোলাকৃতি, ডগার দিক তীক্ষ্ণ। মৌসুমের শুরুতে ফল ধরতে থাকে এবং পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত গাছে থাকে। জলের তলায় এই গাছের কাঠ সহজে নষ্ট হয়না। তাই বন্দরে নৌকা তৈরীতে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশে অর্থনৈতিক মূল্যে সেগুনের পরই জারুল কাঠের স্থান।

[চিত্র 30—31]

বকুল

Mimusops elengi L.
Fam : Sapotaceae.
Flowering period : April-June.

Indian medler/Spanish Cherry

এটা সুন্দর গন্ধযুক্ত মাঝারী ধরনের চিরহরিৎ গাছ। শান্তিনিকেতনের বকুলবীথি ও অন্যান্য স্থানে গাছ পাওয়া যায়। পাতা ঘন সবুজ রঙের ও চক্চকে। পাতা ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, উপবৃত্তাকার। ফুল তারকাকার, ঈষৎ হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত এবং গুচ্ছাকারে পাতার মাঝে মাঝে ফুটে থাকতে দেখা যায়। ফুল ছোট ছোট। ফলগুলো লম্বাটে গোলাকার, ১ ইঞ্চি লম্বা, পাকলে কমলা রঙের হয়। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে। গাছটির আদি নিবাস এই ভারতবর্ষে।

আমলকি

Emblic mykabolam

Embelica officinalis Gaeth.
Fam : Euphorbiaceae.
Flowering period : August-November

এটি মাঝারী আকারের পর্ণমোচী গাছ। শান্তিনিকেতনের রতনকুঠী ও মন্দির এলাকায় দেখা যায়। এগাছের সৌন্দর্য্যে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট ছিলেন এবং বহু কবিতায় এর উল্লেখ করেছেন। গাছের ত্বক ধূসর বর্ণের ও মসৃণ। পাতা ছোট ছোট, মৌলিক পত্র কিন্তু সরু সরু ডালের উপর সারি সারি সাজানো পাতাগুলো দেখতে ঠিক এক পক্ষল যৌগিক পত্রের মতো। ছোট ছোট হলুদাভ সবুজ ফুলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে। ফুলগুলি একলিঙ্গ। ফল ফিকে হলুদ বর্ণের, রসালো এবং গোলাকার। পাকলে ঈষৎ লাল বর্ণের হয়। এর ফল খাওয়া যায়। ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C আছে। এ গাছে ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে। এর আদি নিবাস এশিয়া মহাদেশে।

[চিত্র 32—33]

ফাগুন-বউ (সোনালী শিমুল)

Yellow silk cotton/Butter cup tree

Cochlospermum qossypium DC
Fam : Bixaceae.
Flowering period : February-March

এটি মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। শান্তিনিকেতনের শান্তিনিকেতন বাড়ীর কাছে উদ্যান বিভাগের বাগানের মধ্যে গাছ আছে। পাতা করতলাকার যৌগিক, অনেকটা তুলো গাছের পাতার মতো। পাতাহীন গাছে বাসন্তী রঙের বড় বড় ফুলগুলো খুব সুন্দর লাগে। ফুলে পাপড়ি পাঁচটি, যুক্ত নহে, সুতোর মতো হলুদ রঙের পুংকেশর থাকে। উপবৃত্তাকার বড় বড় ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। গাছটি সাধারণতঃ 15—20 ফুট উঁচু হয়। মার্চ মাসে ফুল আসে। গাছটি ভারতীয় উপমহাদেশের আদি-বাসিন্দা।

[চিত্র 34—35]

নাগকেশর (নাগেশ্বর)

Iron wood Tree

Mesua ferrea L.
Fam : Clusiaceae
Flowering period : February-April.

এক একটি মাঝারি আকারের, পিরামিডাকৃতি, চিরহরিৎ, সুন্দর বৃক্ষ। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ও রতনকুঠীতে দু'একটি গাছ দেখা যায়। গাছের ত্বক লালচে বাদামী ও মসৃণ। কচি লাল পাতার জন্য গাছের উপরের অংশ দেখতে লাল রঙের হয়। লম্বা উত্তলাকার পাতার নীচে সাদা রঙের একটা স্তর থাকে। পাতাগুলো সাধারণতঃ 4—6 ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল বড়, সাদা রঙের, সুগন্ধযুক্ত এককভাবে পুষ্পদণ্ডের উপর সাজানো থাকে। ফুলটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর অসংখ্য হলুদ বর্ণের পুংকেশরের জন্য। সাধারণতঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে।

[চিত্র 36—37]

কুরচি

Easter tree/Ivory tree

Holarrhena antidysentrica (Roth.) A. D. C.
Fam : Apocynaceae
Flowering period : July-September

এটি মাঝারী আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। শান্তিনিকেতনের সব জায়গাতেই দেখা যায়। উচ্চতায় প্রায় ২০-২৫ ফুট হয়। পাতা লম্বাটে, উপবৃত্তাকার, অগ্রভাগ সূচালো, বোঁটা ছোট। ফুল সাদা রঙের, মৃদু গন্ধযুক্ত, গুচ্ছাকারে পুষ্পমঞ্জরীর উপর সাজানো থাকে। ফুল গুলো অনেকটা টগরের মতো দেখতে। ফল বিদারী, সরু ও লম্বা, একই ফুলের বোঁটায় দুটো করে থাকে। ফলগুলি প্রায় ৮-১২ ইঞ্চি লম্বা। সাধারণতঃ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে। কুর্চি গাছের ছাল আমাশয়ের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

[চিত্র 38—39]

গুলঞ্চ

Pagoda tree

Plumeria rubra L.
Fam : Apocynaceae
Flowering period : March-October.

মাঝারী ধরনের গাছ। শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের শ্যামলী বাড়ীর সামনে এবং অন্যত্র গাছটি দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৫-২০ ফুট উঁচু হয়। গাছে আঘাত করলে ঘন দুধের ন্যায় পদার্থ (তরুক্ষীর) বের হয়। গাছটি পর্ণমোচী। শাখা-প্রশাখার অগ্রে পাতাগুলো ঘনভাবে সাজানো থাকে। পাতা উত্তলাকার, বড় এবং উপরিভাগ চক্‌চকে। লাল রঙের ফুলগুলো পুষ্পদণ্ডের উপর অনিয়তভাবে গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। সম্ভবতঃ এই গাছটি মেক্‌সিকো থেকে এসেছে এদেশে। সাধারণতঃ মার্চ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে। এ গাছের ফুল পূজায় ব্যবহৃত হয়। গাছের ছাল ও মূল নানা রোগের ওষুধ তৈরীর কাজে লাগে। এ গাছের আরও কয়েকটি প্রজাতি শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

[চিত্র 40—41]

শাল

Shoea robusta Gaertn. f.
Fam : Dipterocarpaceae
Flowering period : March-April

শাল একটি বৃহৎ বৃক্ষ। শান্তিনিকেতনের শালবীথিতে শালগাছের সারি দেখা যায়। শাল গাছ ৩০-৩৫ ফুট উঁচু হয়। এর ত্বক বাদামী রঙের এবং ফাটা ফাটা, অমসৃণ হয়। পাতাগুলি প্রায় ডিম্বাকার, সবুজ ও চকচকে হয়। প্রায় ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পমঞ্জরী শাখা-প্রশাখা যুক্ত, গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকে। ফুলগুলি ছোট ছোট, ফিকে সবুজ বর্ণের। ফুলগুলিতে তিনটে লম্বা ডানা থাকে। ডানাগুলি ফল ছড়াতে সাহায্য করে। শালকাঠ খুব শক্ত হয় এবং বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ এবং আরো অনেক কাজে লাগে। সাধারণতঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে।

[চিত্র 42—44]

Explanations of Figures (1 —64)

1. Amrakunja (Mango grove) of Santiniketan.
2. Flowering twigs of *Mangifera indica* (Anacardiaceae—Am).
3. Flowering twigs of *Azadirachta indica* (Meliaceae—Nim).
4. General habit of *Jacaranda mimosifolia* (Bignoniaceae—Jacaranda).
5. Flowering twigs of the same.
6. Flowering twigs of *Saraca indica* (Caesalpiniaceae—Ashok)
7. Flowers of the same.
8. General habit of *Tectona grandis* (Verbenaceae—Segun)
9. General habit of *Spathodea campanulata* (Bignoniaceae—Rudrapalash)
10. Flowering twigs of the same.
11. General habit of *Polyalthea longifolia* (Annonaceae—Debdaru)
12. General habit of *Petrea volubilis* (Verbenaceae—Nilmonilata)
13. Flowering twig of the same.
14. General habit of *Delonix regia* (Caesalpiniaceae—Radhachura)
15. Flowering twig of the same.
16. General habit of *Anthocephalus indicus* (Rubiaceae—Kadam).
17. Leafy twig of the same with a flower.
18. Chhatimtala of Santiniketan.
19. Leafy twig of *Alstonia scholaris* (Apocynaceae—Chhatim).
20. General habit of *Bauhinia purpurea* (Caesalpiniaceae—Kanchan).
21. Flowering twigs of the same.
22. General habit of *Butea monosperma* (Papilionaceae—Palash).
23. Flowering twig of the same.
24. Single flower of the same.
25. Fruits of *Bombax malabarica* showing cotton (Bombacaceae—Simul).
26. Stem with fruits of *Artocarpus heterophylla* (Moraceae—Kanthal).
27. General habit of *Ficus benghalensis* (Moraceae-Bot) and *Borassus flabelifer* (Arecaceae-Tal)
28. General habit of *F. benghalensis* (Farm house, Sriniketan)
29. Plant of *F. benghalensis* showing prop roots. (Farm house, Sriniketan).
30. General habit of *Lagerstroemia indica* (Lythraceae—Jarul).
31. Flowering twig of the same.

32. General habit of *Emblica officinalis* (Euphorbiaceae—Amlaki).
33. Flowering twig of the same.
34. General habit of *Cochlospermum gossypium* (Bixaceae—Fagoonbou).
35. Flowering twigs of the same.
36. General habit of *Mesua ferrea* (Clusiaceae-Nagkeshar).
37. Flowers of the same.
38. General habit of *Holarrhena antidysenterica* (Apocynaceae—Kurchi).
39. Stem trunk of the same with flowers.
40. General habit of *Plumeria acutifolia* (Apocynaceae—Gulancha).
41. Flowering twig of the same.
42. Salbithi of Santiniketan.
43. General habit of *Shorea robusta* (Dipterocarpaceae—Sal).
44. Branch of the same with flowers.
45. Flowering twigs of *Ixora coccinea* (Rubiaceae—Rangan).
46. Flowering twigs of *Caesalpinia pulcherrima* (Caesalpiniaceae—Krishnachura).
47. General habit of *Couroupita guianensis* (Lecythidaceae—Nagalingam).
48. Stem trunk of the same with flowers.
49. Flowers of the same.
50. Flowering twig of *Magnolia grandiflora* (Magnoliaceae—Bilatichampa).
51. General habit of *Cycas circinalis* (Cycadaceae—A temperate plant).
52. Male cone of the same.
53. General habit of *Tagetes patula* with flowers (Asteraceae—Ganda).
54. General habit of *Helianthus annus* with flowers (Asteraceae—Suryamukhi).
55. Flowers of *Dahlia pinnata* (Asteraceae—Dalia).
56. General habit of *Parthenium hysterophorus* (Asteraceae—Parthenium).
57. Flowering twig of the same.
58. Pollination (Insect visiting flower for nectar).
59. Pollination.
60. Flowering twig of *Quisqualis indica* (Combretaceae—Madhumalati).
61. Flowering twig of *Hibiscus rosa-sinensis* (Malvaceae—Jaba).
62. Flowering twig of *Pterosperum-acerifolium* (Sterculiaceae—Muchkunda).
63. Flowering twig of *Bougainvillea spectabilis* (Nyctaginaceae—Baganbilas).
64. *Ibis* sp. (Stork—Saras).


1


2


3




5


6


7


8



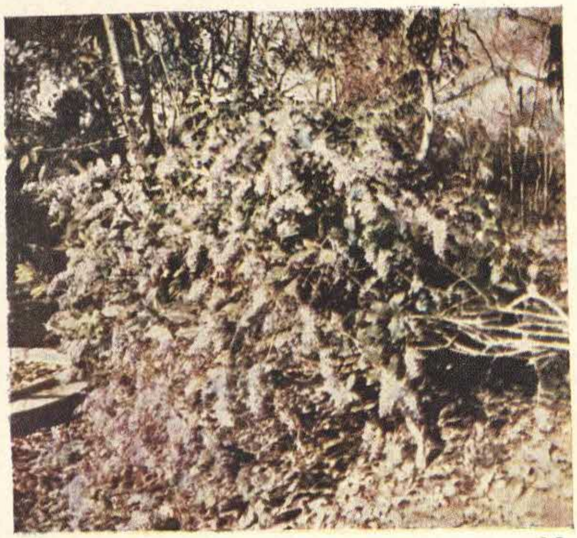
9



10



11



12



13



14



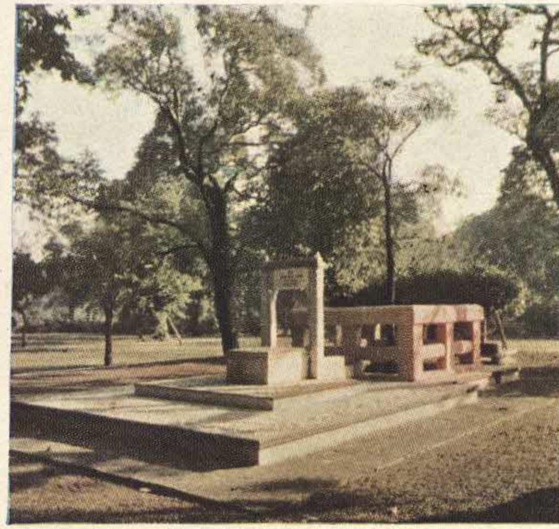
15



16



17



18



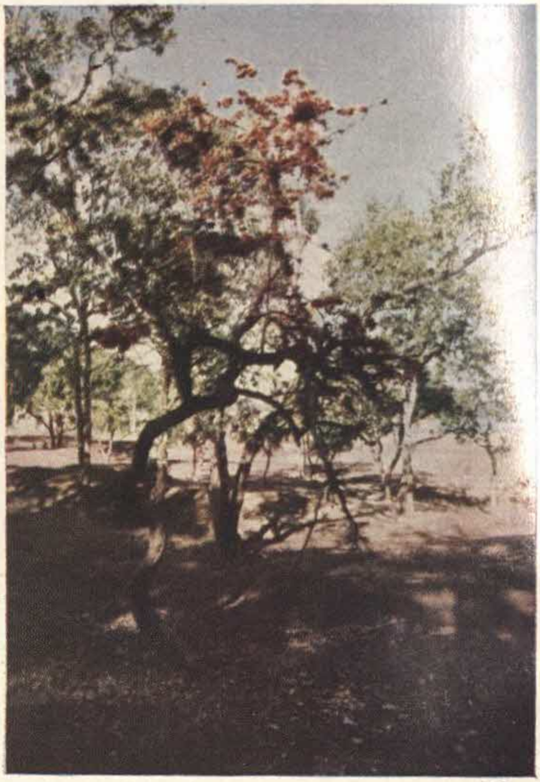
19



20



21



22



23

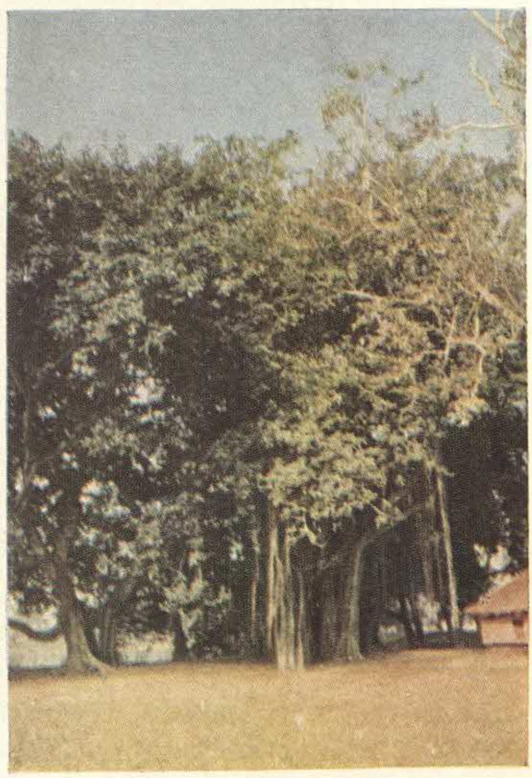


24


25


26


27


28



29



30



31



32



33



34



35



36


37

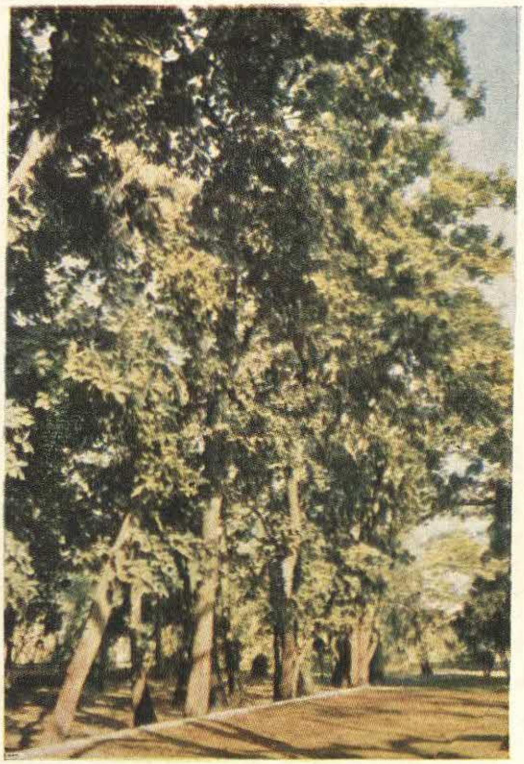

38


39

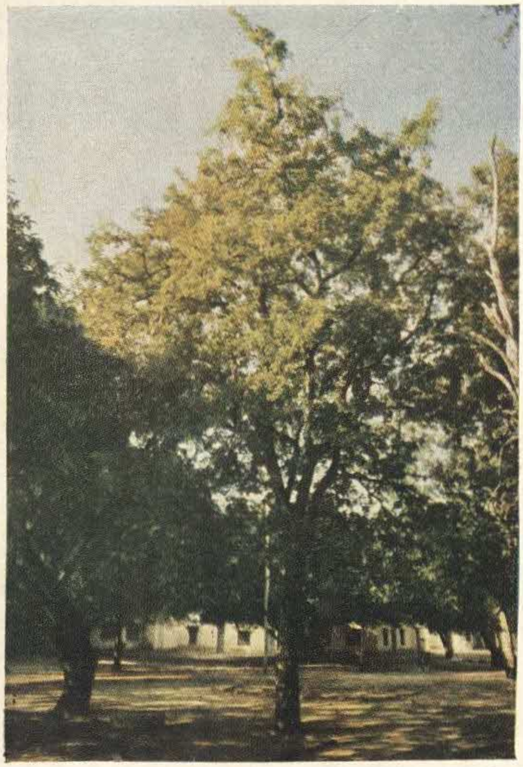

40



41



42



43



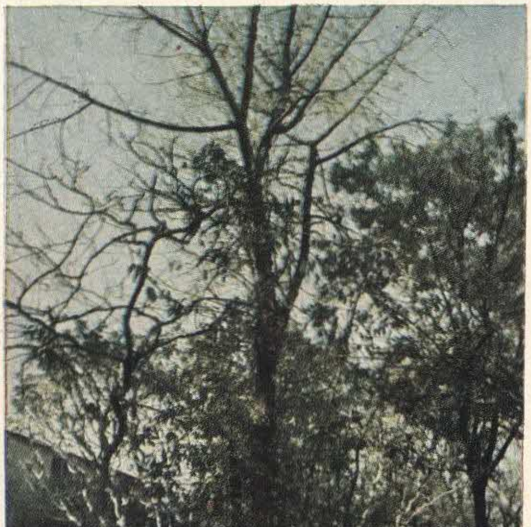
44



45



46



47



48



49



50



51



52


53


54


55


56



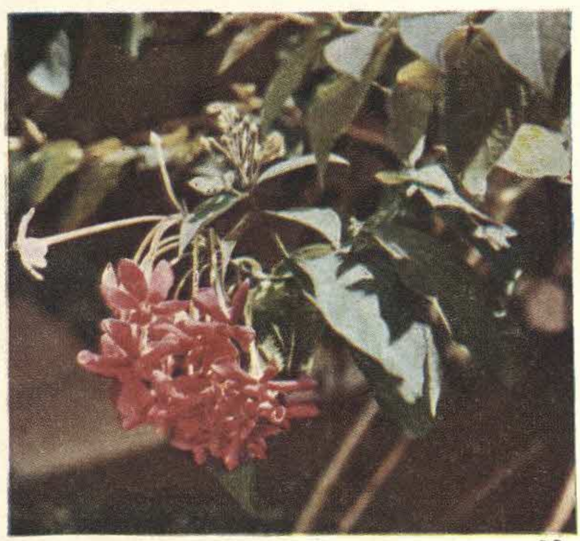
5 7



58



59



60



61



62



6 3



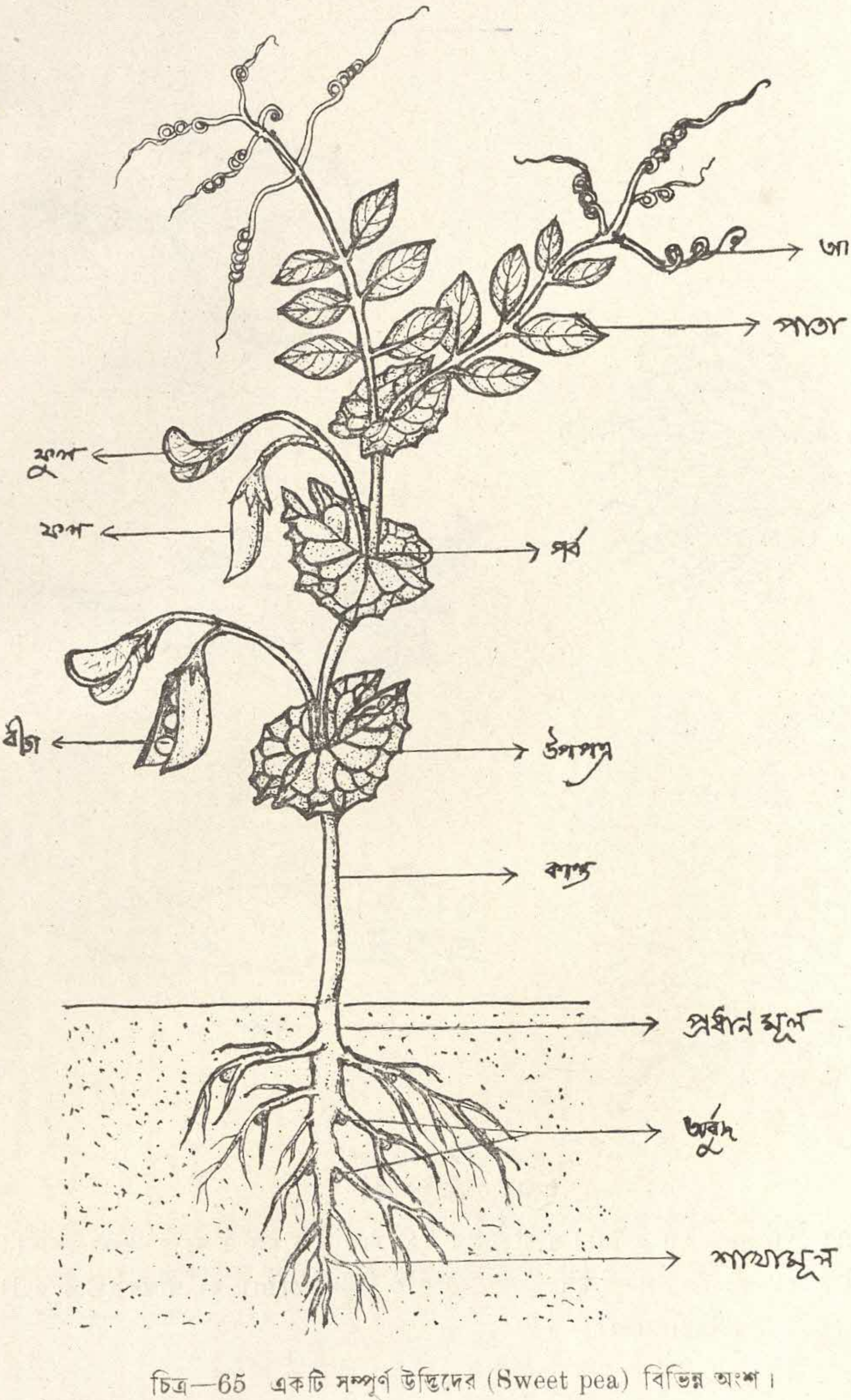
64

Explanations of Figures (1 —64)

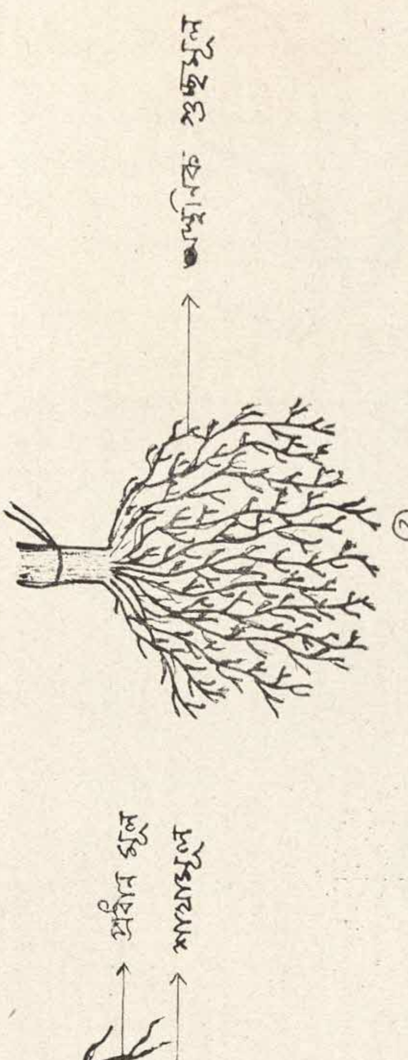
1. Amrakunja (Mango grove) of Santiniketan.
2. Flowering twigs of *Mangifera indica* (Anacardiaceae—Am).
3. Flowering twigs of *Azadirachta indica* (Meliaceae—Nim).
4. General habit of *Jacaranda mimosifolia* (Bignoniaceae—Jacaranda).
5. Flowering twigs of the same.
6. Flowering twigs of *Saraca indica* (Caesalpiniaceae—Ashok)
7. Flowers of the same.
8. General habit of *Tectona grandis* (Verbenaceae—Segun)
9. General habit of *Spathodea campanulata* (Bignoniaceae—Rudrapalash)
10. Flowering twigs of the same.
11. General habit of *Polyalthea longifolia* (Annonaceae—Debdaru)
12. General habit of *Petrea volubilis* (Verbenaceae—Nilmonilata)
13. Flowering twig of the same.
14. General habit of *Delonix regia* (Caesalpiniaceae—Radhachura)
15. Flowering twig of the same.
16. General habit of *Anthocephalus indicus* (Rubiaceae—Kadam).
17. Leafy twig of the same with a flower.
18. Chhatimtala of Santiniketan.
19. Leafy twig of *Alstonia scholaris* (Apocynaceae—Chhatim).
20. General habit of *Bauhinia purpurea* (Caesalpiniaceae—Kanchan).
21. Flowering twigs of the same.
22. General habit of *Butea monosperma* (Papilionaceae—Palash).
23. Flowering twig of the same.
24. Single flower of the same.
25. Fruits of *Bombax malabarica* showing cotton (Bombacaceae—Simul).
26. Stem with fruits of *Artocarpus heterophylla* (Moraceae—Kanthal).
27. General habit of *Ficus benghalensis* (Moraceae-Bot) and *Borassus flabelifer* (Arecaceae-Tal)
28. General habit of *F. benghalensis* (Farm house, Sriniketan)
29. Plant of *F. benghalensis* showing prop roots. (Farm house, Sriniketan).
30. General habit of *Lagerstroemia indica* (Lythraceae—Jarul).
31. Flowering twig of the same.

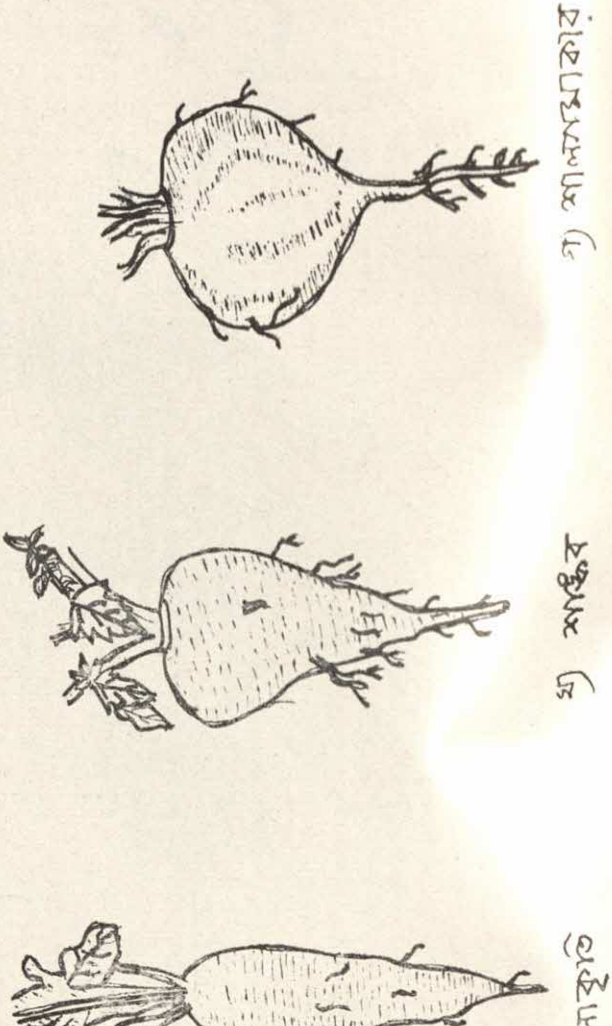
32. General habit of *Emblica officinalis* (Euphorbiaceae—Amlaki).
33. Flowering twig of the same.
34. General habit of *Cochlospermum gossypium* (Bixaceae—Fagoonbou).
35. Flowering twigs of the same.
36. General habit of *Mesua ferrea* (Clusiaceae-Nagkeshar).
37. Flowers of the same.
38. General habit of *Holarrhena antidysenterica* (Apocynaceae—Kurchi).
39. Stem trunk of the same with flowers.
40. General habit of *Plumeria acutifolia* (Apocynaceae—Gulancha).
41. Flowering twig of the same.
42. Salbithi of Santiniketan.
43. General habit of *Shorea robusta* (Dipterocarpaceae—Sal).
44. Branch of the same with flowers.
45. Flowering twigs of *Ixora coccinea* (Rubiaceae—Rangan).
46. Flowering twigs of *Caesalpinia pulcherrima* (Caesalpiniaceae—Krishnachura).
47. General habit of *Couroupita guianensis* (Lecythidaceae—Nagalingam).
48. Stem trunk of the same with flowers.
49. Flowers of the same.
50. Flowering twig of *Magnolia grandiflora* (Magnoliaceae—Bilatichampa).
51. General habit of *Cycas circinalis* (Cycadaceae—A temperate plant).
52. Male cone of the same.
53. General habit of *Tagetes patula* with flowers (Asteraceae—Ganda).
54. General habit of *Helianthus annus* with flowers (Asteraceae—Suryamukhi).
55. Flowers of *Dahlia pinnata* (Asteraceae—Dalia).
56. General habit of *Parthenium hysterophorus* (Asteraceae—Parthenium).
57. Flowering twig of the same.
58. Pollination (Insect visiting flower for nectar).
59. Pollination.
60. Flowering twig of *Quisqualis indica* (Combretaceae—Madhumalati).
61. Flowering twig of *Hibiscus rosa-sinensis* (Malvaceae—Jaba).
62. Flowering twig of *Pterosperum-acerifolium* (Sterculiaceae—Muchkunda).
63. Flowering twig of *Bougainvillea spectabilis* (Nyctaginaceae—Baganbilas).
64. *Ibis* sp. (Stork—Saras).

পরিশিষ্ট—২ক



চিত্র—65 একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদের (Sweet pea) বিভিন্ন অংশ।

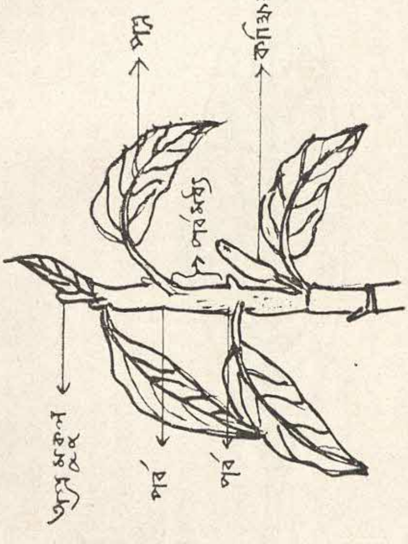


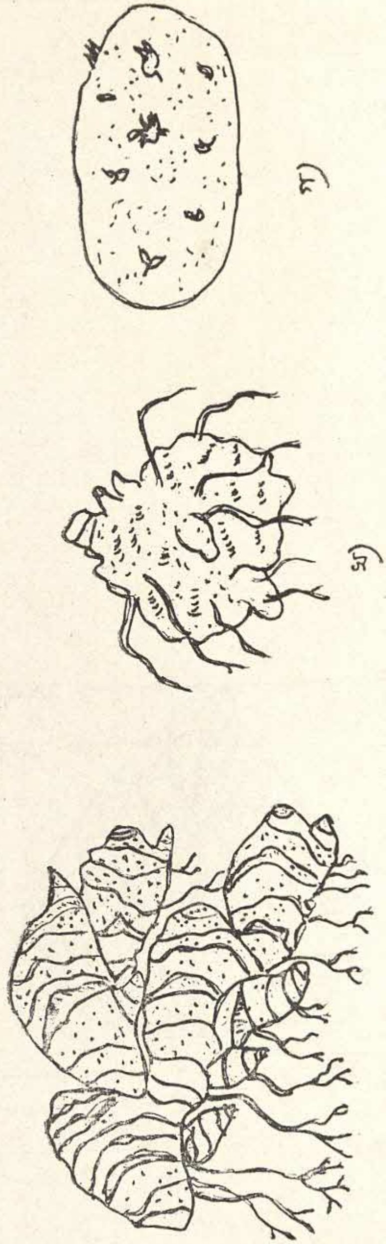


মূলের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

চিত্র—66 (১) প্রধান মূল ও উহার শাখাপ্রশাখা (২) অস্থানিক মূল ও উহার শাখাপ্রশাখা।
চিত্র—67 (৩) পরিবর্তিত প্রধান মূল— ক) মূলাকৃতি (Fusiform) খ) শাঙ্কব (Conical) গ) শালগমাকার (Napiform)।





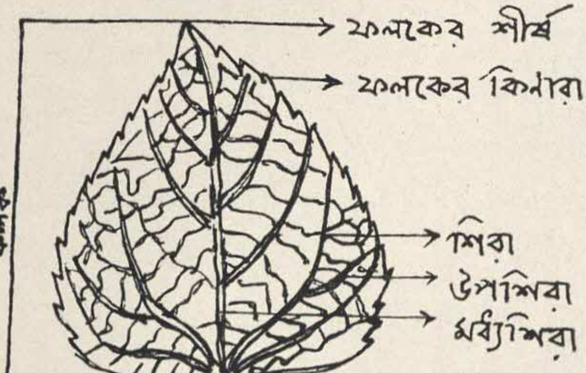


কাণ্ডের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

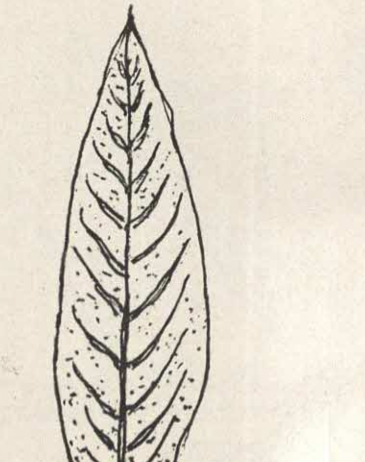
চিত্র—68 (১) কাণ্ডের (অগ্রস্থ) বিভিন্ন অংশ (২) পাথরকুচির পত্রাশ্রয়ী মুকুল।
চিত্র—69 (৩) পরিবর্তিত মৃদ্গত কাণ্ড— ক) গ্রন্থিকন্দ (Rhizome) খ) গুঁড়িকন্দ (Corm) গ) স্ফীতকন্দ (Tuber)।



ঘ)

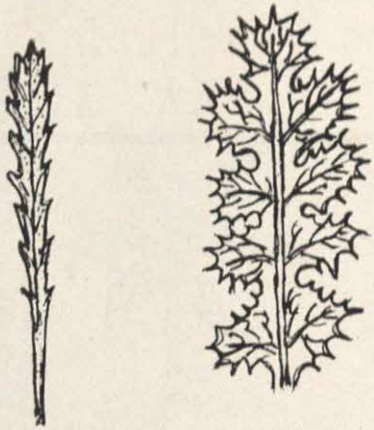


①



②

চিত্র—70 (ঘ) পরিবর্তিত মৃদ্গত কাণ্ড—কন্দ (Bulb)। চিত্র—71 (১) আদর্শ পাতার বিভিন্ন অংশ। চিত্র—72 (২) আম পাতার উপাধানবিশিষ্ট পত্রমূল।

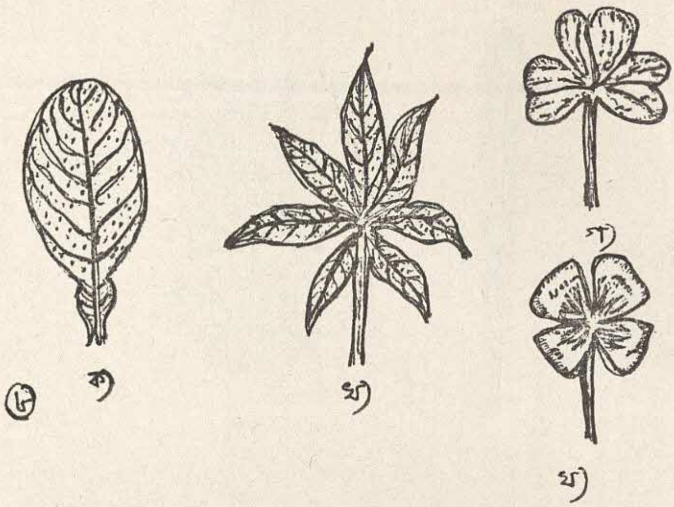


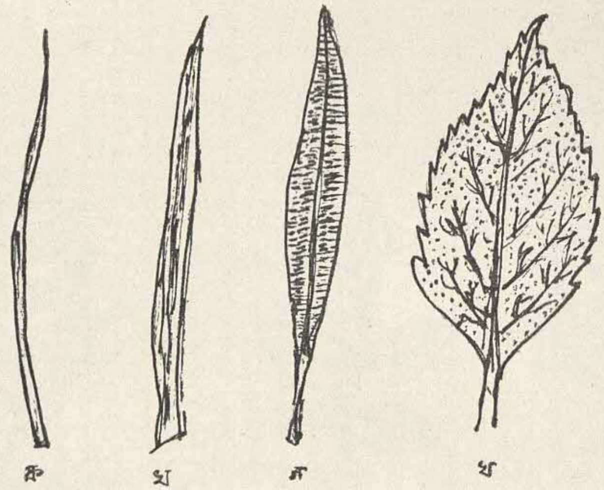
৩ ৪



৫ ৬ ৭

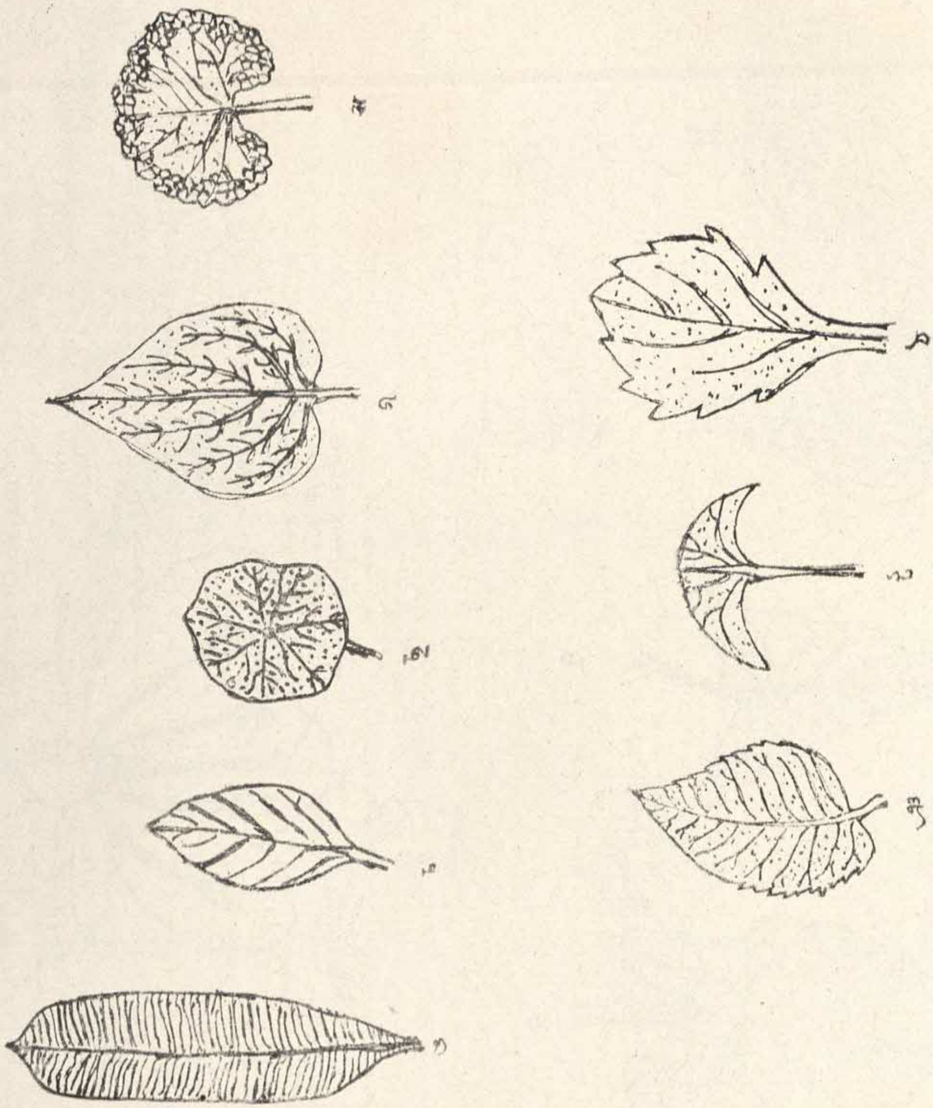
চিত্র—73 (৩) চন্দ্রমল্লিকার পক্ষাবৎ খণ্ডিত এককপত্র (৪) শিয়ালকাঁটার পক্ষাবৎ উপখণ্ডিত এককপত্র। চিত্র—74 (৫) গোলাপের যৌগিক পত্র (৬) অপরাজিতার সচূড় পক্ষল (৭) কালকাসুন্দির অচূড় পক্ষল।





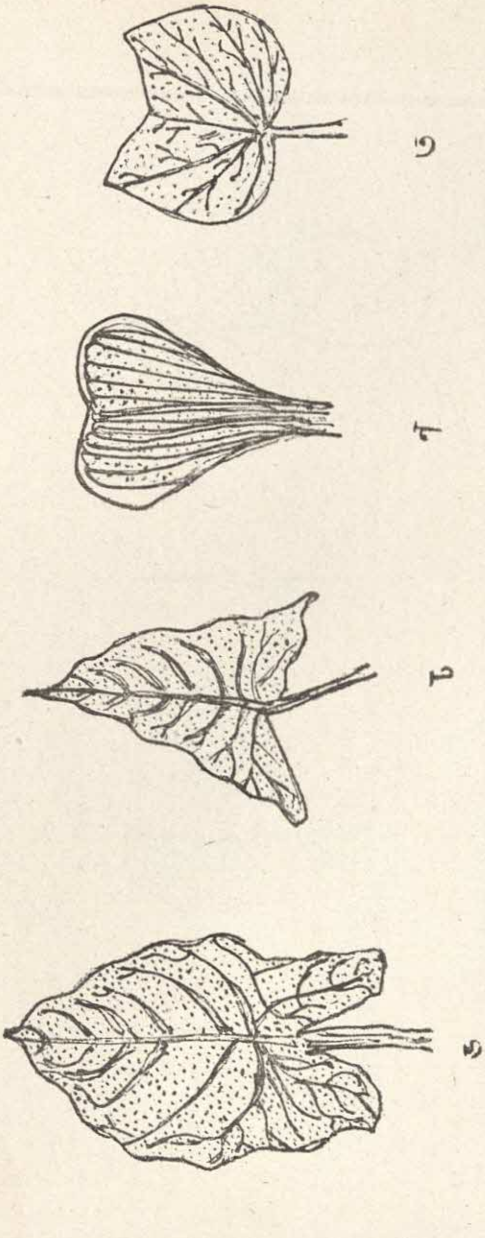
পাতার আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস :

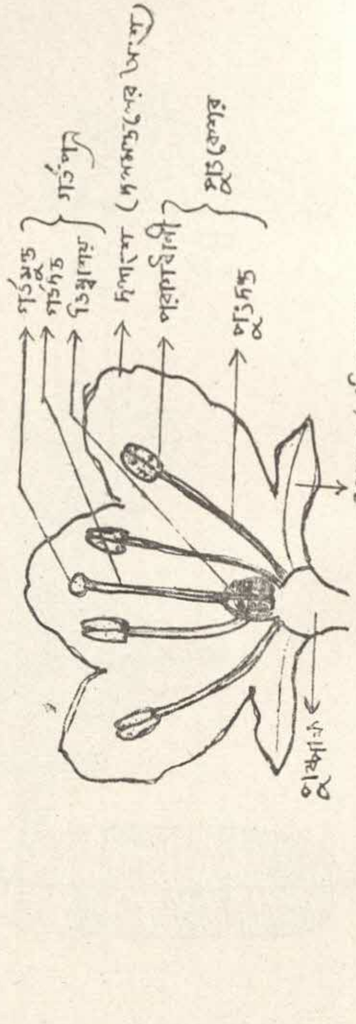
চিত্র—75 (৮) করতলাকার যৌগিক পত্র— ক) লেবুর একফলক পত্র (খ) শিমূলের বহুফলক পত্র (গ) আমরুলের ত্রিফলক পত্র (ঘ) শুশ্‌নির চতুর্ফলক পত্র। চিত্র—76 ক) সূচ্যাকার (Acicular) খ) রেখাকার (Linear) গ) ভল্লাকার (Lanceolate) ঘ) ডিম্বাকার (Ovate)।



পাতার আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস

চিত্র—77 ঙ) আয়তাকার (Oblong) চ) ডিম্বাকার (Oval) ছ) গোলাকার (Round)। চিত্র—78 জ) তাম্বুলাকার (Cordate) ঝ) বৃক্কাকার (Reniform)। চিত্র—79 ঞ) বিষমাকার (Oblique) ট) অর্ধচন্দ্রাকার (Lunate) ঠ) চমসাকার (Spathulate)।

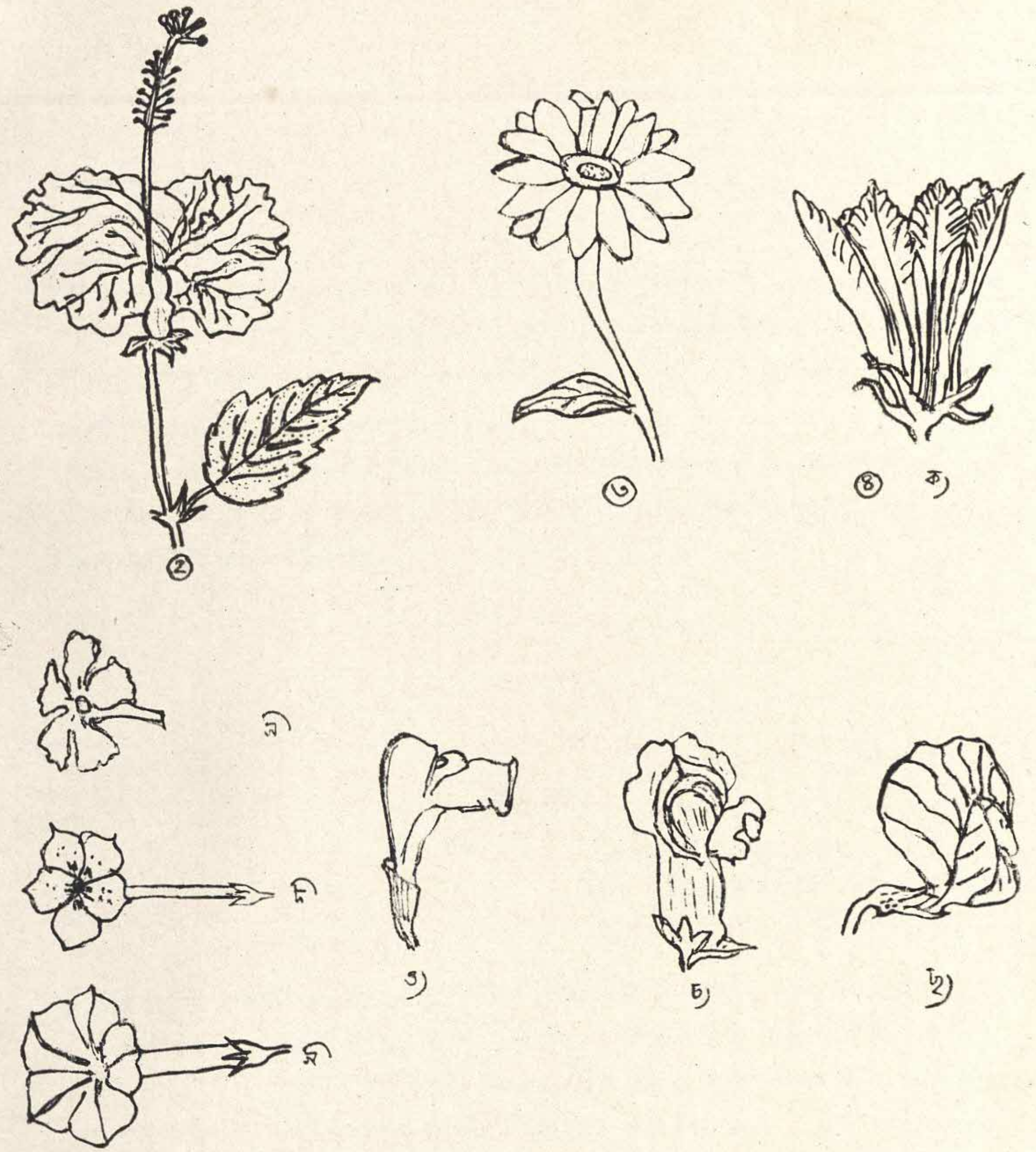




পাতার আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস :

চিত্র—80 ঙ) মানপত্রাকার (Sagittate) চ) কলম্বপত্রাকার (Hastate) ণ) কীলকাকার (Cuneate) ত) বিতাম্বুলাকার (Obcordate)।

চিত্র—81 (১) একটি আদর্শ পুষ্পের বিভিন্ন অংশ (লম্বচ্ছেদ)।



দলমণ্ডলের আকার :

চিত্র—82 (২) জবার একক পুষ্পবিন্যাস। চিত্র—83 (৩) সূর্যমুখীর পুষ্পবিন্যাস (৪) দলমণ্ডলের আকার— ক) ঘন্টাকার (Campanulate)। চিত্র—84 খ) ধুতুরাকার (Infundibuliform) গ) রঙ্গণাকার (Hypocrateriform) ঘ) চক্রাকার ([illegible])। চিত্র—85 ঙ) ওষ্ঠধরাকৃতি (Bilabiate) চ) উপমুখ (Personate) ছ) [illegible] (Papilionaceous)।

রঙ্গন

Torch tree

Ixora coccinea L.
Fam : Rubiaceae
Flowering period : April-September

রঙ্গন একটি বীরুৎ জাতীয় ঝাঁকড়া গাছ। এর দু'-তিন ধরণের প্রজাতি শান্তিনিকেতনের প্রায় সব বাগানেই দেখা যায়। পাতা বৃন্তহীন, ঘন সবুজ বর্ণের লম্বাটে উপবৃত্তাকার। ফুলগুলি সংখ্যায় প্রচুর, ছাতার মতো গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। দূর থেকে এক একটি গুচ্ছকে এক একটি ফুল বলে মনে হয়। ফুলগুলি ছোট ছোট, চারটে পাপড়ি বিশিষ্ট, দলনল খুব সরু ও লম্বা হয়। রঙ টকটকে লাল বর্ণের হয়। ফল দেখা যায় না। প্রায় সারা বছর ফুল হয় তবে গ্রীষ্মকালে বেশী ফোটে। রঙ্গনের এই প্রজাতি ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির ফুলের রঙ সাদা, ফিকে গোলাপী, হলুদ রঙের হয়।

[চিত্র—45]

কৃষ্ণচূড়া

Peacock Flower
Paradise Flower

Caesalpinia pulcherrima Sw.
Fam : Caesalpiniaceae
Flowering period : February-September

কৃষ্ণচূড়া গাছটি শান্তিনিকেতনের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ইহা একটি বীরুৎ শ্রেণীর ছোট গাছ। সাধারণতঃ উচ্চতায় ১০-১২ ফুট। পাতাগুলি বাবলার মতো দ্বিপক্ষল কিন্তু বড় হয়। কাণ্ডের গায়ে কাঁটা আছে। পুষ্পমঞ্জরীগুলি বড়, শক্ত এবং খাড়াভাবে থাকে। ফুলগুলি সাধারণতঃ মাঝারি আকৃতির, হলুদ ও লাল রঙের হয়। পাপড়ি পাঁচটি, বিযুক্ত এবং পুংকেশর গুলি বেশ বড় ও বাইরের দিকে বের হ'য়ে থাকে। ফলগুলি চ্যাপ্টা, শুঁটী জাতীয়। ৫-৬টি ক'রে বীজ থাকে। শুকিয়ে গেলে শুঁটী কুঞ্চিত হয়ে যায়। সম্ভবতঃ গাছটির আদি-নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফুল ফোটে।

[চিত্র—46]

নাগলিঙ্গম (কামানগোলা)

Cannonball tree

Couroupita guianensis Aubl.
Fam : Lecythidaceae
Flowering period : April-May

নাগলিঙ্গম গাছটি শান্তিনিকেতনের নাট্যঘরের পিছনের দিকে উত্তরায়ণের বাগানের মধ্যে দেখা যায়। গাছটি বৃহৎ বৃক্ষবিশেষ। গুঁড়ি মোটা এবং গুঁড়ি থেকে পুষ্পমঞ্জরীগুলি বেরিয়ে আসে। ফুলের রঙ ফিকে হলুদ। ফুলগুলি ১ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের ভিতর দিকের কেন্দ্রটি লালচে রঙের। পুংকেশরচক্রটি সাপের ফণার মতো গর্ভকেশরচক্রের গর্ভদণ্ডের উপর বেঁকে থাকে। তাই এর নাম নাগলিঙ্গম। পাতাগুলি বড়, লম্বাটে, উপবৃত্তাকার। ফলগুলি বড়, শক্ত, গোলাকার, ৬-৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, কালচে বাদামী রঙের, কামানের গোলার মতো দেখতে। তাই এর ইংরাজী নাম "Cannon-ball tree"। এই চিরহরিৎ শ্রেণীর বৃক্ষটির আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। এপ্রিল-মে মাসে ফুল ফোটে।

[চিত্র 47—49]

পরিশিষ্ট—২

বিভিন্ন ঋতুর ফুল

গ্রীষ্মের ফুল :

কুরচি (চিত্র 38 – 39), টগর, থোকটগর, কাঠচাঁপা, পেলটোফোরাম, শিরীষ, গুল-মোহর (চিত্র—14), জারুল (চিত্র 30—31), কর্ণিকার, সোঁদাল, গন্ধরাজ, বেলী, মধু মালতী (চিত্র—60), বেল গাছ, জবা, সূর্য্যমুখী (চিত্র—54), পদ্ম, কলকে, চাঁপা ও হাস্নুহানা।

বর্ষার ফুল :

জবা (চিত্র—61), কেয়া, কদম (চিত্র 16—17), মালতী, গন্ধরাজ, টগর, থোকটগর, লিলি, হাস্নুহানা, জুঁই, জারুল, দোপাটি, সেগুন (চিত্র—8), ফুরুস ও দোলন চাঁপা।

শরতের ফুল :

মালতী, শিউলী, টগর, কাশ, স্থলপদ্ম, শালুক, দোলনচাঁপা, দোপাটী, জিনিয়া, সূর্য্যমুখী, রজনীগন্ধা, সোনাঝুরি, কলকে, জবা, কামিনী, কুন্দ ও বনপুলক।

হেমন্তের ফুল :

হিমঝুরি, কেশিয়া, স্থলপদ্ম, ডালিয়া (চিত্র—55), গাঁদা (চিত্র—53), চন্দ্রমল্লিকা, শিরীষ ও ছাতিম (চিত্র 18—19)।

শীতের ফুল :

গোলাপ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, কসমস, স্প্যাথোডিয়া (চিত্র 9—10), ফ্লক্স, প্যানজি, সুইটপী (চিত্র—65), স্ন্যাপ ড্রাগন, লেডিস আমব্রেলা, লেডিস লেস্, ক্যাণ্ডিটাফ্ট, ক্যালেনডুলা, সুইট সুলতান ও সুইট ইলিয়া।

বসন্তের ফুল :

আম (চিত্র 1—2), শিমুল (চিত্র—25), পলাশ (চিত্র 22—24), স্প্যাথোডিয়া (চিত্র 9—10), মাধবী, বোগেনভিলিয়া (চিত্র—63), মুচকুন্দ, শিরীষ, বকুল, নাগকেশর (চিত্র 36—37), নাগলিঙ্গম (চিত্র 47—49), নাগেশ্বর, হলিহক্, আকন্দ, মধুমালতী, অশোক (চিত্র 6—7), বনপুলক, মাধবী, শাল (চিত্র 43—44), গ্লিরিসিডিয়া, হলুদ শিমুল ও রঙ্গন (চিত্র—45)।

পরিশিষ্ট—৩

খঞ্জন

Grey Wagtail *Motacilla caspica*

আকার —চড়াই-এর মতো।

পরিচিতি—ছোটখাটো, আঁটসাঁট চেহারার লম্বা লেজযুক্ত পাখী। পালকের রঙ মূলতঃ ছাই ছাই এবং হলুদ। জলের কাছাকাছি, জঙ্গলে ও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। শীতে একই রকমের দেখতে হলেও, গ্রীষ্মে, গলা এবং বুকের উপরিঅংশের রঙ কালো। চটপটে, ছোটখাটো পতঙ্গ ধরবার জন্য সদাই ব্যস্ত এবং এই সময় লেজ অনবরত ওঠানামা করে। কখনও উড়ন্ত পতঙ্গ ধরবার জন্য উড়ে যায়। উড়বার সময় ডানার চিচিপ, চিচিপ শব্দ হয়। পুরুষ পাখী প্রজনন ঋতুতে সুমিষ্ট সুরে ডাকে।

খাদ্য —কীটপতঙ্গ, ফল, ফুলের মধু।

বাসা —মে থেকে জুলাই মাসে শিকড়, ঘাস ও ডালপালা দিয়ে বাসা বাঁধে, গাছের ডালের ফাঁকে। ডিম ৪ থেকে ৬টি, হরিদ্রাভ ধূসর অথবা সবুজাভ রঙের ও লালচে বাদামী ছোপযুক্ত। স্ত্রী ও পুরুষ পাখী বাসা পাহারা দেয়।

প্রাপ্তিস্থান—শীতকালে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশ।

দোয়েল

Magpie Ratrin *Copsychus saularis*

আকার —বুলবুলের আকার।

পরিচিতি—সাদা কালো রঙের পাখী। পাখা ক্যানোর পাখার মতো। পুরুষ পাখীর গায়ের কালো অংশ, স্ত্রী পাখীর ক্ষেত্রে বাদামী এবং হালকা কালো রঙের। মানুষজন যেখানে বাস করে, সেইসব জায়গায় এককভাবে অথবা জোড়ায় বাস করে।

গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সহজেই দেখা যায়। অন্যান্য সময়ে এদের ডাক শোনা না গেলেও প্রজনন ঋতুতে এদের সুমিষ্ট ও সুরেলা ডাক শোনা যায়। ডাক অনেকটা —স্যু-ই-ই'এর মতো। ভোরের দিকে এবং সন্ধ্যার দিকে গাছের উঁচু শাখা থেকে পুরুষ পাখীর ডাক ভেসে আসে। ডাকের সঙ্গে লেজ ঝাঁকিয়ে ওঠে। প্রজনন ক্ষেত্র (Breeding territory) পুরুষেরা পাহারা দেয়।

খাদ্য —কীটপতঙ্গ, ফুলের মধু।

বাসা —এপ্রিল-জুলাই মাসে, ঘাস, শেকড়, ইত্যাদি দিয়ে গাছের গর্তে বা দেওয়ালের ফাটলে বাসা তৈরী করে। ডিম ৩—৫টি, হালকা নীল-সবুজ রঙ, ও লালচে-বাদামী ছোপযুক্ত। স্ত্রী পাখী ডিমে তা দেয়।

প্রাপ্তিস্থান—ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ। ভারত ও পাকিস্তানের শুষ্ক মরু অঞ্চলে (রাজস্থান) এদের দেখা যায় না।

হাঁড়িচাচা

Treepie *Dendrecitta vagabunda*

আকার —ময়নার থেকে বড় অথবা ছোট। লেজ ১২ ইঞ্চির মতো লম্বা।

পরিচিতি—লম্বা লেজের উজ্জ্বল বাদামী রঙের পাখী। মাথা এবং গলা কুচকুচে কালো। লেজের ডগা কালো, এবং উড়বার সময় ডানায় সাদা দাগ দেখা যায়। ওড়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ— ডানার সাহায্যে ওড়ার মাঝে মাঝে পাখা মেলে ভেসে বেড়ায়। গাছপালাপূর্ণ অঞ্চলে বাস করে। জোড়ায় অথবা দলে ঘুরে বেড়ায়। উচ্চ কর্কশ স্বরের বিভিন্ন ধরণের ডাক থেকে এদের নামের উদ্ভব। অথচ এদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—বব-ও-লিং—কো-কি-লব ধরণের ডাক, সুমিষ্ট ও সুরেলা।

খাদ্য —কাকেদের মতো সর্বভুক। বিভিন্ন ফল, কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ, সরীসৃপ ছাড়া ডিম ও অন্যান্য পাখীর ছানা এদের খাদ্য। জঙ্গলের শিকারী পাখীদের দলে এদের দেখা যায়।

বাসা —ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই মাসে এবং প্রধানতঃ মার্চ থেকে মে মাসে ডালপালা দিয়ে তৈরী, গভীর বাসা বাঁধে; পত্রবহুল, মাঝারি আকৃতির গাছে। ডিম ৪—৫, বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের। সাদা রঙের ডিম উজ্জ্বল লালচে-বাদামী ছোপযুক্ত। স্ত্রী ও পুরুষ পাখী উভয়েই বাসা পাহারা দেয় ও ডিমে তা দেয়।

প্রাপ্তিস্থান— ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ।

ফিঙে

Black drongo
King crow

Dicrwrus adsimilis

আকার —বুলবুলের থেকে বড় অথবা ছোট।

পরিচিতি—লম্বাটে চটপটে পাখী। লম্বা লেজ। লেজের প্রান্ত সুস্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত। উজ্জ্বল কালো রঙ। স্ত্রী, পুরুষ, একই রকম দেখতে। খোলামেলা মাঠে, গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। কখনও টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকতেও দেখা যায়। ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ এদের খাদ্য। চারণরত গরু অথবা মহিষের পিঠে বসে থাকে এবং এদের চলার ফলে ঘাস থেকে যে সব পতঙ্গ উড়ে যায়, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডাক বিভিন্ন ধরণের। খাদ্যাভ্যাসের দরুণ কৃষিক্ষেত্রে উপকারী।

খাদ্য —পতঙ্গ ছাড়া ফুলের মধুও খেয়ে থাকে।

বাসা —এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস নাগাদ— খড়কুটো, তন্তু, দিয়ে পাত্রের মতো ছোট বাসা বাঁধে। ডিম, ৩—৫টি। ডিমের রঙ সাধারণতঃ সাদা, লালচে-বাদামী ছিটযুক্ত। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই বাসা পাহারা দেয়।

প্রাপ্তিস্থান—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

বেনেবউ

Black headed Oriob — *Oriolus xanthernna*

আকার —ময়নার মতো।

পরিচিতি—উজ্জ্বল সোনালী-হলুদ গায়ের রঙ। মাথার রঙ কুচকুচে কালো। গলা এবং বুকের উপরিঅংশ কালো। ডানা ও লেজের রঙও কালো। উজ্জ্বল গোলাপী ঠোঁট, ক্রিমসন-লাল চোখ। স্ত্রী, পুরুষ একই রকম তবে স্ত্রী পাখীর মাথার কালো রঙ একটু লাল। নবীন পাখীর মাথার সামনের দিক হলুদ এবং মাথার অন্য অংশ হলুদ দাগযুক্ত। গাছেই থাকে। তরল, বাঁশীর মতো আওয়াজ। এছাড়া কর্কশ ও নাকি আওয়াজের ডাক, হাঁড়িচাঁচার সঙ্গে ভুল হতে পারে।

খাদ্য —পোকা, ফল এবং ফুলের মধু।

বাসা —এপ্রিল-জুলাই মাসে গাছের ডালের ফাঁকে, মাটির প্রায় ১২-৩০ ফিট ওপরে ঘাস ও গাছের তন্তু দিয়ে সুন্দরভাবে বাসা তৈরী করে। ডিম ২—৩টি সাদা রঙের ওপর কালো বা লালচে বাদামী ছিট। স্ত্রী ও পুরুষ ডিম পাহারা দেয়।

প্রাপ্তিস্থান—আসাম বাদ দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও কখনও শ্রীলঙ্কায়।

বসন্তবৌরী

Copporsmith
Crimson breasted barbate — *Megalasma haemacephala*

আকার —চড়াই-এর থেকে বড়।

পরিচিতি—ভারী ঠোঁটযুক্ত, ঘাস-সবুজ পাখী। বুক এবং মাথার ওপরের অংশ ক্রিমসন লাল, হলুদ গলা ও সবুজ দাগযুক্ত হলুদাভ শরীরের নীচের অংশ। ছোট লেজ উড়বার সময় স্পষ্টতঃ ত্রিকোণাকার। ডাক— উচ্চস্বরে, পরিচিত 'টুক-টুক'।

সমস্ত দিন ধরে অল্প বিরতির পরপর একই ডাকের পুনরাবৃত্তি। পুরুষ ও স্ত্রী পাখী একই রকম। এককভাবে অথবা দলে ফলযুক্ত গাছে বিশেষ করে বট ও অশ্বত্থ গাছে বসে থাকে।

খাদ্য —ফল, বিশেষ করে বট ও অশ্বত্থ গাছের ফল। কখনও ডানাযুক্ত উইপোকা ধরে খেতেও দেখা যায়।

বাসা —জানুয়ারী-জুন মাসে নরম বহিস্কযুক্ত গাছের (প্রায় পলতেমাদার ও সজিনা) শুকনো ডালে গর্ত তৈরী করে বাসা করে। ডিম অনুজ্জ্বল সাদা, এক একবারে ৩টি। স্ত্রী ও পুরুষ ডিম পাহারা দেয়।

প্রাপ্তিস্থান—দক্ষিণের স্যাঁতসেতে জঙ্গল ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ।

মোহনচূড়া

Hoopae *Upupa epops*

আকার —ময়নার থেকে বড়।

পরিচিতি—বাদামী রঙের পাখী, পিছনে সাদা কালো দাগ। পাখা ও লেজেও ঐরকম লম্বা দাগ আছে। ছোট পাখার মতো চূড়ো মাথায়। ঠোঁট লম্বা, সরু এবং অল্প বাঁকানো। পুরুষ ও স্ত্রী পাখী একই রকম দেখতে। গ্রাম বা শহরের আশেপাশে খোলা জমিতে হাঁটে অথবা দৌড়ায় এবং মাটিতে খাবারের সন্ধান করে। উড়বার সময় মাথায় চূড়ো থাকে ও ঠোঁট চিমটের মতো আধখোলা অবস্থায় থাকে। মূলতঃ উড়ে এসে বসবার সময় ও চড়ে বেড়াবার সময় কখনও কখনও চূড়ো খুলে যায়। ডাক— প্রায় ১০ মিনিট ধরে হু-পো-পো।

আবাস —এককভাবে অথবা জোড়ায় মাটিতে চরতে দেখা যায়। সাধারণতঃ খোলামেলা বাগানে এরা চরে বেড়ায়।

খাদ্য —কীটপতঙ্গ, শুঁয়োপোকা, ইত্যাদি। খাদ্যাভ্যাসের দরুণ কৃষিক্ষেত্রে উপকারী।

বাসা —ফেব্রুয়ারী-মে মাস নাগাদ গাছের গর্তে বা বাড়ীর ফাটলে খড়কুটো, কাগজ, ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী অগোছালো বাসা তৈরী করে। এক একবারে সাদা রঙের ৫-৬টি ডিম পাড়ে।

প্রাপ্তিস্থান—সমস্ত ভারতবর্ষ। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশ।

নীলকণ্ঠ

Indian Roller
Blue Joy

Coracias benghalensis

আকার —পায়রার আকার।

পরিচিতি—উজ্জ্বল নীল বর্ণ, বড় মাথা, কালো ভারী ঠোঁট, বাদামী গলা, হালকা নীল উদর ও লেজের তলা, পাখা খুললে গাঢ় ও হালকা নীল রঙের রেখা দৃশ্যমান হয়। পুরুষ ও স্ত্রী পাখী একই রকম।

আবাস —ধানী জমি, বাগান ও টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকতে দেখা যায়।

খাদ্য —বড় পোকা, ব্যাঙ, গিরগিটীর উপর আক্রমণ করে। কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী পাখী, কারণ এরা অনেক ক্ষতিকর পোকা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।

বাসা —মার্চ-জুলাই মাসে, খড়কুটো, কাগজ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি দিয়ে গাছের প্রাকৃতিক গর্তে বাসা করে। বাড়ীর ফাটলেও বাসা করে।

প্রাপ্তিস্থান—হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত। বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানেও পাওয়া যায়।

সরাল

Lesser Whistling Teal

Dendroeygna javanica

আকার —পাতি হাঁসের চাইতে ছোট।

পরিচিতি—ছোট, হালকা বাদামী ও লালচে রঙের হাঁস। পুরুষ ও স্ত্রী একই রকমের। উড়তে খুব পটু নয়। ওড়ার সময় ডানায় সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণ শিষ দেওয়ার মতো আওয়াজ করে থাকে— যা শুনতে অনেকটা 'সি-সিক, সি-সিক'; এই রকমের।

আবাস —ছোট দলে, জলজ উদ্ভিদে ভর্তি পুকুরে থাকে। জলের আশেপাশে গাছ থাকলে এরা প্রায়ই বিশ্রাম নেয়। ভাল উড়তে না পারলেও খুব ভাল হাঁটতে পারে এবং জলে ডুব দিতে পারে।

খাদ্য —শামুক, পোকামাকড়, মাছ ব্যাঙ ছাড়া কচি ডাঁটা, ধান, চারাগাছ। সাধারণতঃ দিনের বেলায় পুকুরে বা জলার ধারে বিশ্রাম নিয়ে রাত্রে কাছের ধানের ক্ষেত ইত্যাদিতে চরতে যায়।

বাসা —জলার ঠিক ধারে অথবা একটু দূরে জমির ওপর ঘাস, পাতা দিয়ে নরম গদির মতো বাসা বানায়। গাছের গুঁড়ির খাঁজে অথবা ফাঁকেও বাসা বানায়। বাসা বানানোর সময় প্রধানতঃ বর্ষাকাল— জুন থেকে অক্টোবর।

ডিম —৭ থেকে ১২টি হাতির দাঁতের মতো সাদা। পুরুষ ও স্ত্রী দুই পাখীই ডিমে তা দেয় ও সন্তান লালন করে।

প্রাপ্তিস্থান—প্রায় সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। একই জায়গায় দীর্ঘকাল বসবাস করে। বন্যা অথবা খরায় স্থানীয়ভাবে স্থান পরিবর্তন করে।

নাখতা

Nakhta or Combduck *Sarnidiornis melanotos*

আকার —পাতি হাঁসের থেকে বড়।

পরিচিতি—বড় হাঁস, দেহের ওপরের পালক চক্চকে নীল ও সবুজ সমেত কালো। দেহের তলার পালক সাদা। মাথা ও গলায় কালো ছিটে। ঠোঁটের ওপর, লেজের কাছে (বিশেষ করে প্রজনন ঋতুতে) বড় একটি ফোলা অংশ বিশেষভাবে এদের চিহ্নিত করে। স্ত্রী পাখী, পুরুষদের মতোই তবে আকারে ছোট এবং ঠোঁটের ওপর ফোলা অংশ নেই।

আবাস —ছোট দলে, আগাছাপূর্ণ জলায় থাকে। হাঁটায়, জলে ডুব মারায় এবং গাছে বসতে বেশ পটু।

ডাক —নীচু, ব্যাঙের মতো ডাক, প্রজনন ঋতুতে এই ডাক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

বাসা —জুলাই-সেপ্টেম্বর, জলের মধ্যে অথবা ধারে গাছের কেটকে কাঠকুটো, ঘাস, পাতা ইত্যাদি দিয়ে বাসা বানায়।

ডিম —৮-১২টি হালকা ক্রীম রঙের, মসৃণ ডিম। কেবলমাত্র স্ত্রী পাখীদেরই ডিমে তা দিতে দেখা যায়।

প্রাপ্তিস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ ও বাংলাদেশ। স্থায়ী বাসিন্দা অথবা স্থানীয়ভাবে পরিবারী। শান্তিনিকেতনে শীতের পাখী।

বালিহাঁস

Cotton Teal *Nettapus coromandelianus*

আকার —পায়রার থেকে বড়।

পরিচিতি—সবচেয়ে ছোট বুনো হাঁস। পালকে সাদা রঙই বেশী। ছোট ঠোঁট, গোড়ার দিকে গভীর। পুরুষ হাঁসের ওপরের পালক চক্চকে কালো, মাথা, গলা ও

তলার দিকে সাদা। গলায় সুস্পষ্ট কলারের মতো বেড় দেওয়া কালো পালক। ডানাতেও সাদা ছোপ আছে। স্ত্রী হাঁসের রঙ ফিকে বাদামী, গলায় অথবা ডানায় কোন বিশেষত্ব নেই। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ হাঁসের ওপরের রঙ অনেকটা স্ত্রী হাঁসের মতো তবে ডানায় সুস্পষ্ট ছাপের সাহায্যে এদের চেনা যায়।

আবাস —দলবদ্ধভাবে পুকুর, জলাভূমি, জলে ভর্তি ধানের ক্ষেত, সেচের খাল ও বাঁধে দেখা যায়। বিরক্ত না করলে অথবা ক্ষতি না করলে অনায়াসে মানুষের খুব নিকট উপস্থিতি স্বীকার করে নেয়। উড়তে যেমন পটু তেমনি জলে চমৎকার ডুবতে পারে।

ডাক —ওড়ার সময় অদ্ভুত একটা আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন শব্দ এদের মুখ থেকে শোনা যায় না।

খাদ্য —প্রধানতঃ শাকশব্জী। পোকামাকড়ও খেয়ে থাকে।

বাসা —জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে জলের মধ্যে অথবা জলের ধারে কোন গাছের কোটরে ঘাস, পালক ইত্যাদি দিয়ে বাসা বাঁধে।

ডিম —৬-১২টি হাঁতির দাঁতের মতো সাদা ডিম।

প্রাপ্তিস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশ। শান্তিনিকেতনে শীতের পাখী।

পরিশিষ্ট—৪

প্রাকৃতিক সম্পদ

ক) সূচনা :

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করি। মাটি, গাছপালা, জল ও বাতাস আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য। বনানী অঞ্চলে বা অরণ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে সহাবস্থান করে। আমাদের যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় ঘটে। এই অপচয় বন্ধ করার দায়িত্ব আমাদের— এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। প্রত্যেক দেশের কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে কিন্তু কোনও দেশের সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। কাজেই আমাদের জীবনধারণের তাগিদে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণের স্বার্থে যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা উচিত— এই বোধ শিশু ও কিশোরদের মনে জাগাতে হবে। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ। নির্বিচারে বৃক্ষছেদন করা, দীঘী, পুকুরের জল দূষিত করা, মাটিতে ক্রমাগত আবর্জনা স্তূপীকৃত রাখা ইত্যাদি যে ঘোরতর অন্যায় সেই বোধের উন্মেষ করাতে হবে। পক্ষান্তরে, বৃক্ষরোপণও পালন করা, বনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা, দীঘী, পুকুরের জল পরিষ্কার রাখা এবং মাটিকে মাতৃসম (Mother earth) জ্ঞান ও যত্ন করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য [চিত্র—86]।

খ) মাটি, পাথর ও খনিজ :

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের উৎস হচ্ছে মাটি—চাল, ডাল, আলু, গম, শাকশব্জী, ফলমূল ইত্যাদি পাই মাটি থেকে। মাটি থেকে জল, খনিজ এবং পুষ্টি সংগ্রহ করে গাছপালা আর এইভাবে কৃষিজ শস্য থেকে আমরা পাই আমাদের খাদ্য। আবার অনেক গাছপালার উপর জীবনধারণ করে অধিকাংশ প্রাণী। গবাদিপশুর খাদ্য হচ্ছে ঘাস ও গাছপালা। এখানে খাদ্য শৃঙ্খলের উল্লেখ করা চলে (মাটি→উদ্ভিদজগৎ→প্রাণিজগৎ→মানুষ)।

ভূ-তাত্ত্বিক (geologic) প্রক্রিয়ায় মাটির উৎপত্তি হয়েছে পাথর থেকে। জল ও বাতাসের প্রভাবে বহু যুগ ধরে এই প্রক্রিয়া চলে এবং এখনও চলেছে। এই প্রসঙ্গে তিনটি পরীক্ষা দেখানো চলে : (১) ছোট পাথরের (খুব শক্ত নয়) দুটি টুকরো কিছুক্ষণ ঘসলে

মাটির কণা উৎপন্ন হয়। (২) দুটি ছোট পাথরের টুকরো উত্তপ্ত করে একটি পাত্রে বরফ গলা জলের মধ্যে ফেললে পাথরের টুকরো গুঁড়ো হয়ে যায়। (৩) অনুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি মাটির নমুনা পরীক্ষা করলে নানারকম ও নানা আকারের কণার মাটি, বালি. পাথর-সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। নানা জায়গার মাটির নমুনা পরীক্ষা করলে মাটির প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখা যায় (এঁটেল মাটি, বালি মাটি, খোয়াই ইত্যাদি)। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কিম্বা লেন্সের (magnifying lens) সাহায্যে মাটির মধ্যে নানারকম জীবাণু, পোকামাকড় ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। মাটির ওপরের আস্তরণ (topsoil) (প্রায় ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সেমি) গাছপালার জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ জগৎ প্রয়োজনীয় খনিজ ও জল মাটির এই আস্তরণ থেকে সংগ্রহ করে। জলের সন্ধানে কিছু গাছের শিকড় মাটির আরও গভীরে প্রবেশ করে। গাছপালা মাটির শক্তিবৃদ্ধি করে এবং জল ও বাতাসের প্রকোপে যে অবস্থা হয় তা রোধ করে। তাছাড়া মাটির জলধারণের ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

মাটির অবক্ষয় (soil erosion) শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং খরার (drought) অনুকূল। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাটির অবক্ষয়ের ফলে অনেক প্রাচীন সভ্যতা (যেমন, মিশরীয় সভ্যতা) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

তাই মাটি সংরক্ষণের (soil conservation) গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের স্বার্থে মাটির উর্বরতা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলকে নিতে হবে। তারজন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল বনসংরক্ষণ করা, বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করা এবং বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষপালন অব্যাহত রাখা [চিত্র—86]।

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে (শাকসব্জী, দুধ, ফলমূল) কিছু কিছু খনিজ থাকে যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। একটি পরীক্ষা করে দেখানো যায়।

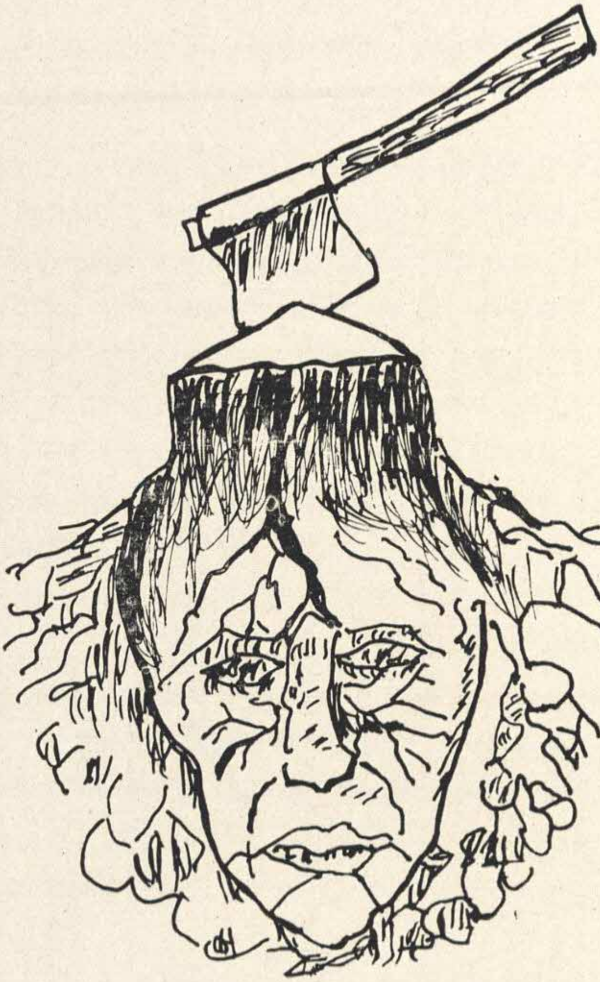
পরীক্ষা—একটি পোর্সিলেন পাত্রে কিছু সব্জীর পাতা ছোট ছোট করে কেটে শুষ্ক অবস্থায় পোড়ানো হল। তারপর ছাইয়ের মধ্যে জল দিয়ে ভালভাবে মেশানো হল। এবার আস্তে আস্তে জলীয় ভাগ তাপের দ্বারা বাষ্পীকরণ করলে দেখা যাবে পাত্রের মধ্যে খনিজচূর্ণ রয়েছে।

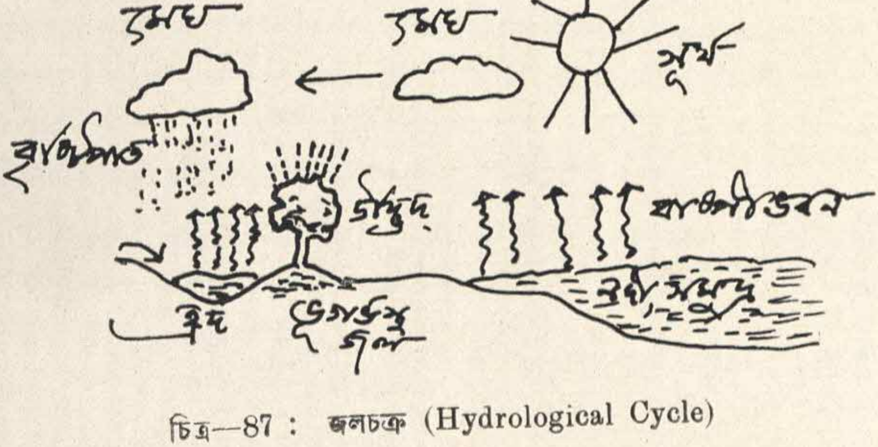
মাটি থেকে জড়পদার্থ হিসাবে খনিজ পাওয়া যায়। পাথর ও খনিজ দ্বারা গঠিত কিছু খনিজ অমূল্য মণিমুক্তা হিসাবে খ্যাত। হীরা, জহরত, গোমেদ পাথর ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে কয়লা, পেট্রোলিয়াম আমাদের বহুল ব্যবহৃত খনিজ যা আমাদের

চিত্র—86 : বনসংরক্ষণ

একটি গাছ—

একটি প্রাণ





চিত্র—87 : জলচক্র (Hydrological Cycle)

শক্তির চাহিদা মেটায় (দৈনন্দিন জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহৃত আর মোটর গাড়ী, বিমান ইত্যাদিতে পেট্রোল, ডিজেল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।

পাথর নানারকম খনিজে গঠিত। ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুয়ায়ী নানা শ্রেণীর পাথর দেখা যায়— আগ্নেয়শিলা (igneous), পাললিক শিলা (sedimentary) ও রূপান্তরিত শিলা (metamorphic)। গলিত সিলিকেট থেকে আগ্নেয়শিলা তৈরী হয়। এই পর্য্যায়ে বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নেই। পাথর থেকে মাটির উৎপত্তির প্রসঙ্গ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। রাস্তা, ঘরবাড়ী নির্মাণে পাথর বাবহৃত হয় আর খনিজভিত্তিক নানা ধাতুশিল্প ও কলকারখানা মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাচ্ছে। সাধারণভাবে বলা চলে, খনিজ-সম্পদের উপর একটি দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশেই প্রচুর খনিজ রয়েছে এবং উভয় দেশই বিশেষ উন্নত। খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে —যথেচ্ছ ব্যবহারে নিঃস্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গ) বাতাস ও জল :

বাতাস–বাতাসের প্রধান উপাদান হল নাইট্রোজেন (৭৮·০৯%), অক্সিজেন (২০·৯৪%) ও জলীয় বাষ্প (০·১ – ৫%)। তাছাড়া খুব অল্প পরিমাণে থাকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (০·০৩%), আরগন, নিয়ন, হিলিয়াম ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডল কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়— ট্রোপোস্ফিয়ার (troposphere) (০ – ১১ কিমি), ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (stratosphere) (১১—৫০ কিমি), মেসোস্ফিয়ার (mesophere) (৫০—৮৫ কিমি) এবং থার্মোস্ফিয়ার (thermosphere) (৮৫—৫০০ কিমি)।

আমরা বাস করি ট্রোপোস্ফিয়ারে— এখানে তাপমাত্রা মাটির কাছাকাছি ১৫° থেকে উপরের দিকে— ৫৬° সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব হ্রাস পায়— চাপের পরিমাণ সমুদ্রের কাছে ১ এটমোস্ফিয়ার (atmosphere) আর ১০০ কিমি উচ্চতায় ৩ × ১০$^{-৭}$ এটমোস্ফিয়ার এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় ১৫° সেন্টিগ্রেড থেকে ১২০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডলের ওজন বা ভর পৃথিবীর ভরের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ। ট্রোপোস্ফিয়ারের ভর সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ভরের শতকরা ৭০ ভাগ।

বাতাসের প্রাকৃতিক ধর্ম এবং আমাদের প্রাণধারণের জন্য বাতাসের প্রয়োজনীয়তা কয়েকটি সহজ পরীক্ষায় বোঝানো যায়।

(১) একটি ছোট গ্যাসজারে একটি জ্বলন্ত লম্বা কাঠি ঢোকাও। কাঠিটা জ্বলতে

থাকবে। উপরের জারের মুখে ঢাকা দাও— কাঠি কিছুক্ষণ পরে নিভে যাবে। বাতাস বা অক্সিজেনের অভাবে কাঠি নিভে যায়। এই পরীক্ষায় বাতাস বা অক্সিজেনের দহনকার্য্যে সহায়তা করার ক্ষমতা প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) উঁচু পাহাড়ে ওঠার সময় আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কারণ বাতাসের চাপ কমে যায় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় শ্বাসগ্রহণে আমাদের কষ্ট হয়। পর্বত অভিযাত্রীদের তাই অক্সিজেন সিলিণ্ডার নাকে লাগিয়ে রাখতে হয়।

রান্নার জন্য ব্যবহৃত উনানের ধোঁয়া, মোটর গাড়ী, লরি ও বাসের ধোঁয়া, ট্রেণ ও কলকারখানার ধোঁয়া থেকে নানারকম গ্যাসীয় আবর্জনা ও বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এতে বায়ুমণ্ডলের মৌলিক গঠন, প্রকৃতি ও ভারসাম্য নষ্ট হয় যার পরিণতি বায়ুদূষণ। কয়লাখনি অঞ্চলে যেমন, রাণীগঞ্জে, ধানবাদে বসবাসকারী জনসাধারণ প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে কয়লাগুঁড়া দেহের মধ্যে গ্রহণ করছে এবং শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগের শিকার হয়। দূষিত বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কাজেই বায়ুদূষণের প্রতিকার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য যদিও এই কাজ খুবই কঠিন।

শান্তিনিকেতনে বাতাস মোটামুটি দূষণমুক্ত বলা চলে। শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতায় পেঁছলে বায়ুদূষণ অনুভব করা যায়। কলিকাতায় বায়ুদূষণ অত্যধিক।

বায়ুদূষণ প্রতিকারের উপায়গুলি সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া দরকার— (১) দৈনন্দিন বাড়ীর কাজে উনানে কয়লার ব্যবহার কমানো। (২) ট্রেণগুলিতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার করা (৩) মোটরগাড়ী, ট্রাক ও বাসগুলিতে এঞ্জিন নিঃসৃত দূষণমুক্ত করার আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং (৪) কলকারখানাগুলিতে বায়ুদূষণ রোধের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জল—ভূ-পৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ জলে আবৃত। পৃথিবীর শতকরা ৯৭% জল মহাসমুদ্রের মধ্যে কিন্তু এই জল লবণাক্ত তাই আমাদের ব্যবহারের অনুপযোগী। শতকরা ২ ভাগ জল রয়েছে মেরু অঞ্চলের বরফের মধ্যে বন্দী এবং মাত্র শতকরা ১ ভাগ জল (নদী, হ্রদ, ঝরণা ও মাটির নীচের জল) আমাদের আয়ত্তের মধ্যে।

কয়েকটি দেশে প্রাচীন সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে জল সরবরাহের ভূমিকা সংশ্লিষ্ট। মিশরীয় সভ্যতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আমাদের নানাবিধ চাহিদা মেটাবার জন্য জলের অবদান অপরিসীম— কৃষিকার্য্যের সেচের জন্য (৩০%), বাষ্পচালিত

বিদ্যুৎ কারখানার জন্য (৫০%), বাড়ীর কাজের জন্য (৭%) এবং কলকারখানার জন্য (১৩%)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জলের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী (তাই বলা হয় জলই জীবন)— পানীয়, রান্না, স্নান ইত্যাদির জন্য। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উৎকৃষ্টমানের জলের প্রয়োজন— দূষিত জল ব্যবহারে নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জলবাহিত রোগে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটছে।

জলের উপাদান হল— ক্যালসিয়াম (calcium, ২০%), ম্যাগনেসিয়াম (magnesium, ৩%), সোডিয়াম (sodium, ৬%), পটাসিয়াম (potassium, ২%), লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (iron, aluminium oxide, ৩%), কার্বনেট (carbonate, ৩৫%), সালফেট (sulphate, ১২%), ক্লোরাইড (chloride, ৬%), সিলিকা (silica, ১২%) এবং নাইট্রেট (nitrate, ১%)।

জলচক্র—পরিবেশে জলচক্রের আবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সৌরতাপে নদী, সমুদ্র থেকে জলের বাষ্পীভবন, বাষ্প থেকে মেঘের রূপান্তর, মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টির জল নদী, সমুদ্রে মেশা এবং ভূ-গর্ভের জলাশয়ে (ground water) মেশা— এই নিয়ে জলচক্র (hydrologic cycle) ছবি সহযোগে ব্যাখ্যা করা যায় [চিত্র—87]। গাছপালা ভূ-গর্ভের জল শোষণ করে নিজ খাদ্য তৈরী করে আর পাতার ছিদ্র দিয়ে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে (transpiration)। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ভারসাম্য বজায় থাকে।

পরীক্ষাগারে জলচক্রের পরীক্ষা দেখানো যায়। একটি কাচের পাত্রে জল ফুটিয়ে সেই ফুটন্ত জলের বাষ্পের উপর একটি কাচের ঢাকা ধরলে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বিন্দু বিন্দু জলে পরিণত হয়। জলের বাষ্পীয় রূপ জলীয় বাষ্প এবং কঠিন রূপ বরফ। রেফ্রিজারেটরের সাহায্যে জল থেকে বরফে রূপান্তর দেখানো যায়।

উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণীজগৎ জীবনধারণের জন্য জলের উপর নির্ভরশীল। মাছ, জলজ প্রাণী, জলজ উদ্ভিদ জলেই প্রাণধারণ করে। পুকুরে কচুরীপানা, পদ্ম, শালুক ইত্যাদি দেখানো যায়।

জলের স্বাভাবিক উপাদান ও প্রকৃতি ব্যাহত হলেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় যার ফলশ্রুতি জলদূষণ। লোকালয়ের প্রয়ঃপ্রণালীর আবর্জনা, কৃষিক্ষেত্রের জল, এবং কল-কারখানার নর্দমার দূষিত জল এই সব প্রাকৃতিক জলাশয়ে (পুকুর, হ্রদ, নদী) মিশে জলদূষণ

সৃষ্টি করে। জলদূষণ অত্যধিক মাত্রায় ঘটলে জলজ প্রাণী, মাছ ও উদ্ভিদ লোপ পায় এবং জনসাধারণ জলবাহিত দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়। আমাদের দেশে গঙ্গা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দূষিত নদী। গঙ্গাদূষণ রোধ করার প্রকল্পে সম্প্রতি ভারত সরকার কাজ আরম্ভ করেছে।

জলদূষণ নিবারণের উপায় সংক্ষেপে বলা যায় এবং কিছু পরীক্ষা করে দেখানো যায়। লোকালয়ের নর্দমার আবর্জনা পৃথকভাবে শোধন করতে হবে কারখানার সাহায্যে (sewage treatment plant) এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ে মেশানো হবে না। কলকারখানার নর্দমার দূষিত আবর্জনা প্রত্যেক কারখানার মধ্যে শোধন করতে হবে এবং জলাশয়ে মেশানো বন্ধ করতে হবে। এই দুরূহ কাজে সরকার ও জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে এবং জনকল্যাণ ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে তৎপর হতে হবে। পরীক্ষাগারে দূষিত জল শোধন করার জন্য বালি ও কাঠকয়লার ফিলটারের ব্যবহার সহজ পরীক্ষার দ্বারা দেখানো যায়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে পুকুর বা পাতকুয়ার জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার হয়, সেখানে জল ফুটিয়ে ছেঁকে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

পরিশিষ্ট (নমুনা)—৫

দেহ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য

যে খাদ্য আমাদের শক্তি যোগায়	যে খাদ্য আমাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে	যে খাদ্য আমাদের সুস্থ রাখে

পরিশিষ্ট (নমুনা)—৬

শারীরিক পরিশ্রম, শ্বাসকার্য্য ও হৃৎস্পন্দন

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	প্রতি মিনিটের হার					
		* পরিশ্রমের আগে			পরিশ্রমের পর		
		হৃৎঘাত	নাড়ীর স্পন্দন	শ্বাসের হার	হৃৎঘাত	নাড়ীর স্পন্দন	শ্বাসের হার

* কি ধরনের পরিশ্রম সেটা উল্লেখ করা দরকার।

পরিশিষ্ট (নমুনা)—৮

(ক) জৈব, অজৈব বস্তু পর্য্যবেক্ষণ

যে সব বস্তু জলে গুলে যায়	যে সব বস্তু জলে গুলে যায় না

(খ)

বস্তুর নাম	তাপ প্রয়োগের আগের অবস্থা	তাপ প্রয়োগের পরের অবস্থা

পরিশিষ্ট (নমুনা)—৯

বস্তু ও শক্তির উৎস

বস্তু	শক্তির উৎস
মানুষ	
শিশু	
বন্দুক	
ঘড়ি	
রিক্সা	
গরুর গাড়ী	
মোটর গাড়ী	
এরোপ্লেন	
টিউবওয়েল	
টর্চ	
রেডিও	
ফ্যান	
সাইকেল	
কলিংবেল	
উইণ্ডমিল	

পরিশিষ্ট (নমুনা)—১০

দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা

খাদ্যের শ্রেণী	প্রাতঃরাশ	দুপুরের খাবার	বিকালের খাবার	রাত্রের খাবার
কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাদ্য				
প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য				
ফ্যাট সমৃদ্ধ খাদ্য				

পরিশিষ্ট : ১০ক

খাদ্য	৭—৯ বৎসর		১০—১২ বৎসর	
	নিরামিষাশী (গ্রাম)	আমিষাশী (গ্রাম)	নিরামিষাশী (গ্রাম)	আমিষাশী (গ্রাম)
চাল। ময়দা	২৫০	২৫০	৩২০	৩২০
ডাল	৭০	৬০	৬০	৬০
সবুজ সব্‌জী	৭৫	৭৫	১০০	১০০
আলু ও অন্যান্য জাতীয় খাদ্য	৫০	৫০	৫০	৫০
ফল	৫০	৫০	৫০	৫০
দুধ	২৫০	২০০	২৫০	২০০
তেল ও ঘি	৩০	৩০	৩৫	৩৫
মাছ, মাংস ও ডিম		৩০	—	৩০
মিষ্টি (শর্করা)	৫০	৫০	৫০	৫০

পরিশিষ্ট—১১

ভিটামিন অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন 'সি'র অভাব	ভিটামিন 'বি'র অভাব	ভিটামিন 'এ'র অভাব
দাঁতের মাড়ি ফুলে যায়, রক্ত পড়ে। দৌর্বল্য। ক্ষতস্থান নিরাময়ে বিলম্ব।	ঠোঁটের ফাঁকে ক্ষত। ঠোঁট এবং জিভে ক্ষত।	রাত্রে চোখে কম দেখতে পাওয়া। চোখে সাদা অথবা ছাই রঙের দাগ। শুষ্ক চোখ।

ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য—

আমলকী, টম্যাটো, পাতি লেবু, অঙ্কুরিত ছোলা, কমলালেবু।	অঙ্কুরিত মুগ, টাটকা ও সবুজ সব্জী, দুধ, মেটে।	আম, পেঁপে, গাজর, দুধ দই ও মেটে।

পরিশিষ্ট—১২

সংক্রামক রোগের তালিকা

জীবাণু	একজন মানুষ থেকে অন্য একজনে সংক্রামণের মাধ্যম					অন্যান্য প্রাণী
	বাতাস	জল	খাবার	প্রত্যক্ষ সংযোগ	কীটপতঙ্গ	
ভাইরাস	ঠাণ্ডা জর ব্রঙ্কাইটিস জলবসন্ত মারীবসন্ত হুপিংকাশি মাম্‌স্ জণ্ডিস্	পোলিও				
ব্যাক্টেরিয়া	ডিপথোরিয়া নিউমোনিয়া মেনিঞ্জাইটিস যক্ষ্মা	টাইফয়েড কলেরা ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি	টাইফয়েড কলেরা	টিটেনাস	প্লেগ (পোকা)	প্লেগ (ইঁদুর)
এককোষ-দেহী		এ্যামেবিক ডিসেনট্রি			ম্যালেরিয়া (মশা)	
কৃমি		গোলকৃমি	গোলকৃমি সুতোকৃমি ফিতাকৃমি	স্কেবিস হুকওয়র্ম	গোদ (মশা)	
ছত্রাক				দাদ		

পরিশিষ্ট—১৩

বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টীকা

বয়স	প্রতিষেধক টীকা
জন্মের ঠিক পর	মারীবসন্ত
৪ থেকে ৯ মাস	বসন্ত (বি. সি. জি) ট্রিপল এ্যান্টিজেন (ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি এবং টিটেনাস) ৪-৬ সপ্তাহ অন্তর তিন মাত্রা। পোলিও—তিন মাত্রা, ৪-৬ সপ্তাহ অন্তর।
১০-১২ মাস বয়সে এবং প্রতি ২ বছর অন্তর	টাইফয়েড
১ বছর	ট্রিপল এ্যান্টিজেন —প্রথম বুস্টার পোলিও —চতুর্থ মাত্রা
স্কুলে যাওয়ার আগে (৫ বছর)	ট্রিপল এ্যান্টিজেন —দ্বিতীয় বুস্টার পোলিও —পঞ্চম মাত্রা বি. সি. জি —প্রথম বুস্টার
১০ বছর	ডিপথেরিয়া; টিটেনাস—বুস্টার

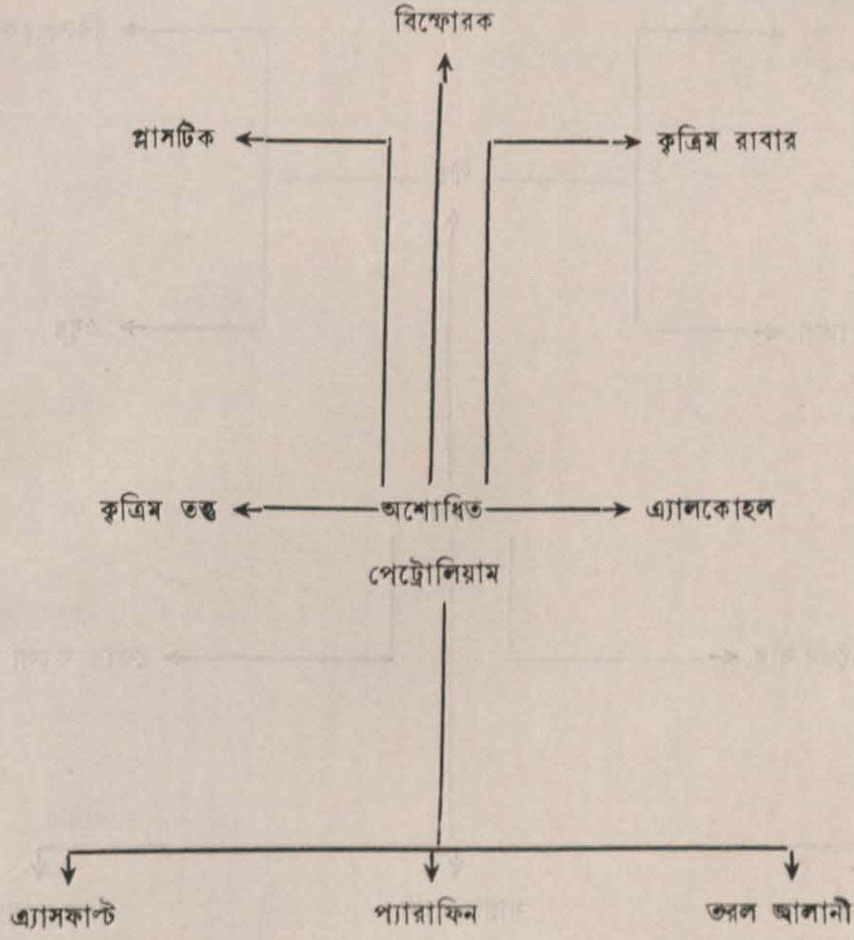
পরিশিষ্ট (নমুনা)—১৪

নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু

মাটির তৈরী	কাচের তৈরী	এ্যালুমিনিয়মের তৈরী	রাবারের তৈরী

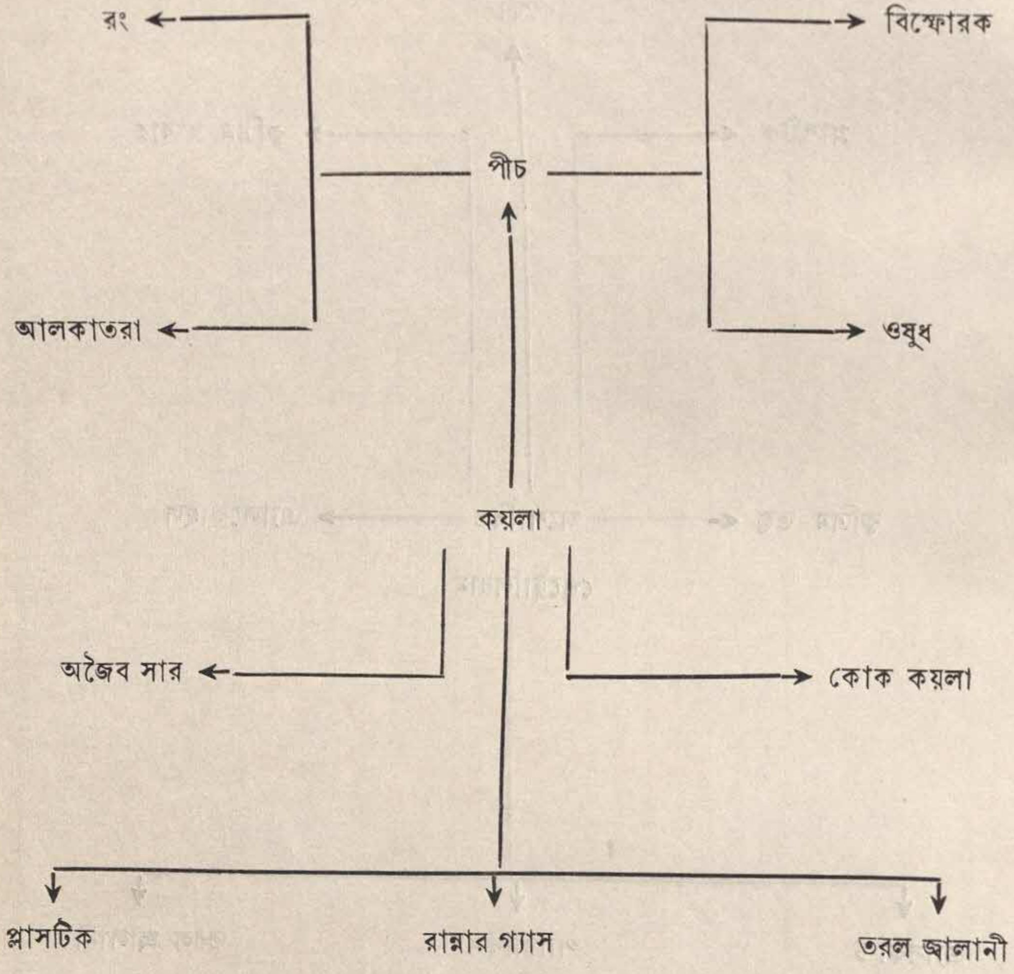
পরিশিষ্ট—১৫ক

পেট্রোলিয়ামজাত বস্তু



পরিশিষ্ট—১৫ খ

কয়লা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন বস্তু



পরিশিষ্ট (নমুনা)—১৬

সূর্যের অবস্থান ও ছায়ার দৈর্ঘ্য

সময়	ছায়ার দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
সকাল ৭-৩০ মিঃ		
সকাল ৯-৩০ মিঃ		
বেলা ১০-৩০ মিঃ		
বেলা ১২-৩০ মিঃ		
দুপুর ২-৩০ মিঃ		
বিকাল ৩-৩০ মিঃ		
বিকাল ৪-৩০ মিঃ		

পরিশিষ্ট (নমুনা)—১৭

বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যাভ্যাস

প্রাণীর নাম	খাদ্য	কিভাবে খায়
১। জন্তু—		
গরু		
ঘোড়া		
কুকুর		
কাঠবেড়ালী		
ইঁদুর		
সাপ		
ব্যাঙ		
বাঁদর		
২। পাখী—		
চড়াই		
কাক		
শালিক		
চিল		
মুরগী		
হাঁস		
কাঠঠোকরা		
ময়না		
৩। পোকামাকড়—		
আরশুলা		
পিঁপড়ে		
শুঁয়োপোকা		
ছারপোকা		

মূল্য ১৫'০০ টাকা

প্রচ্ছদ : দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত